উৎসর্গ পত্র।

যে মহাত্মার পবিত্র নামে হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়, যিনি অমায়িক, সদালাপী, মিষ্টভাষী ও সদ্‌গুণ সমূহের আধার ছিলেন, সেই বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, ডভ্‌টন ও সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের স্বর্গগত সুযোগ্য আরবী ও পারস্যাধ্যাপক ভক্তিভাজন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ

জনাব মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের স্মরণোদ্দেশে

এই

ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি

আন্তরিক

ভক্তি ও শ্রদ্ধা

সহ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা।

পরম করুণাময় বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার কৃপায় ফেরদৌসী-চরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে ইহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া বিশেষরূপে সংসাধিত হইয়াছে এবং ফেরদৌসী-জীবনের কতিপয় নূতন কথাও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী নিজ গুণে ইহা পাঠ করতঃ মহৎ জীবনের মহৎ ভাব গ্রহণ ও মোহনীয় গুণগরিমার সমাদর প্রদর্শন করিলেই আমি আপনাকে সুখী বিবেচনা করিব।

ফেরদৌসী-চরিত ১৩০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালে বহু সংবাদপত্রে ইহার প্রশংসাজনক সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। অতঃপর ১৩০৭ সালের প্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেটের পাঁচটী সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে ইহার সমালোচনা ও গ্রন্থের অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রবীণ সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছিলেন "শেষে আপনার পাঠকবর্গকে একটী বিশেষ অনুরোধ করিতেছি এই যে, তাঁহারা এক এক খানি (ফেরদৌসী-চরিত) আনাইয়া পাঠ করুন। এখানিও (গ্রন্থকারের) মহর্ষি মনসুরের ন্যায় উপাদেয়, পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইবে, একথা সুস্পষ্টই বলিতে পারি।" সমালোচক মহাশয়ের এই অনুরোধ কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা ইহার মুদ্রাঙ্কন-কালের দিকে চাহিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দোষ দিব কার? এ দোষ কাহারও নহে, দোষ কেবল মুসলমান গ্রন্থকারগণের অদৃষ্টের। ইতি—

শান্তিপুর
১৩১৮। জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীমোজাম্মেল হক্

ফেরদৌসী-চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

প্রাচীন ভাষা পারসী অতি মধুর, মনোহর ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা। ইহার লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও মৌলিকত্বের সহিত অন্য ভাষার ঐ সমস্ত বিষয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সুললিত আরব্য ও সংস্কৃত ব্যতীত অপর কোনও একটী ভাষা সমকক্ষতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এই অনন্যসাধারণ কারণ বশতই পারসী ভাষা জগতের সভ্য সমাজে সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার সাহিত্য-শাখা অতি বিশাল ও সুদূর-প্রসারিত। সেই সুধাময় ফল, সৌন্দর্য্যভাণ্ডার সুরভিত পুষ্প ও সুখপ্রদ স্নিগ্ধ ছায়া-সমন্বিত শাখাতলে উপবেশন করিলে অজ্ঞান জ্ঞানভূষিত, সন্তপ্তের তাপ বিদূরিত, দুর্নীতিজ্ঞ নীতিপরায়ণ, ভীরু উৎসাহশীল ও নীরস হৃদয় মধুর রসাভিষিক্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই ভাষায় যত মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, অন্য কোনও ভাষায় তাদৃশ নাই। সুতরাং ইহাকে বিবিধ সদ্-

গ্রন্থের আকর বলা যাইতে পারে। সেই আকরের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় মহামূল্য কোহিনুর "শাহ্‌নামা।" শাহ্‌নামার তুল্য চিত্ত-চমৎকারী, হৃদয়োন্মাদক সুবৃহৎ ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ অতি বিরল। সেই কারণেই অধুনা পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য সমাজে শাহ্‌নামার সমধিক আদর ও গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কোন সভ্য জাতি নাই, শাহ্‌নামা যে জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারের শোভাবর্দ্ধন করে নাই, এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যাঁহারা ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে, রচনা লালিত্যে ও অপূর্ব্ব বিষয়মাহাত্ম্যে মুগ্ধ নহেন। আর না হইবেনই বা কেন? স্বয়ং গজনীপতি মহামতি সুলতান মাহমুদ বিন্ সবক্তগীন ষষ্টি সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ও বহুমূল্য হস্তী-খেলাতাদির বিনিময়ে যে গ্রন্থের গুরুত্ব পরিমাণ করিয়াছিলেন, সে গ্রন্থের সম্যক্ আদর ও গৌরব না হইবে কেন? তাই বলিতেছি, যত দিন জগৎ সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত থাকিবে, যত দিন কবি ও কাব্যের সম্মান থাকিবে, যত দিন পারস্য-সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন কোনক্রমেই এই গ্রন্থের চিরন্তন মর্য্যাদার অণুমাত্রও অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে শাহ্‌নামা কি? তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। এই গ্রন্থে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত আদ্যো-পান্ত কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সেই কবিতার ভাষা সুমিষ্ট, সুমার্জ্জিত, এবং নির্ম্মলসলিল প্রস্রবণের ন্যায় অবাধ ও অনিবার্য্য গতিতে তর্‌তর্ বেগে প্রবাহিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তদ্দেশীয় পূর্ব্বতন নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ, আচার-ব্যবহার, সমাজ-

সভ্যতা, সমর-কৌশল, শাসন-প্রণালী, বিদ্যা-বদান্যতা এবং তাৎ-কালিক লোক-চরিত্র, ক্রীড়া-কৌতুক, শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়; সুতরাং ইহাকে প্রাচীন পারস্য-সাম্রাজ্যের সুবৃহৎ দর্পণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। পাঠক এতৎ পাঠে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই নবরসের জীবন্ত প্রতিমা সকল দর্শন করিয়া কখন করুণ-রসে দ্রবীভূত হইয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, কখন যুবক-যুবতীর পবিত্র প্রেমালাপ শ্রবণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবেন, কখন বীরপুরুষগণের শৌর্য্য-বীর্য্য অবলোকনে বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া অতুল উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিবেন, কখন বা পাপের কালিমাময় বীভৎস চিত্র দর্শনে স্তম্ভিত, ভীত ও বিস্মিত হইয়া অধোবদনে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিবেন, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি। ফলতঃ শাহ্‌নামা যে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই সম্যক্ সন্তোষদায়ক গ্রন্থ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

এই মহাগ্রন্থ ষষ্টি সহস্র শ্লোকে গ্রথিত; রচয়িতা মহামনস্বী কবিবর মওলানা শেখ আবুঅল কাসেম ফেরদৌসী। ফেরদৌসী পারস্য-সাহিত্য-গগনের সংখ্যাতীত নক্ষত্র মধ্যস্থিত সমুজ্জ্বল পূর্ণ-চন্দ্র স্বরূপ এবং তাঁহার কবিতামালা কাব্য-জগতের নন্দন-কাননের পারিজাত পুষ্প সদৃশ। তাঁহার মহাকাব্য শাহ্‌নামা সমুজ্জ্বল রত্ন-খনি হইতেও শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্। যে কাব্যের এত গুণ, এত খ্যাতি, এত গৌরব এবং যে কবির এত সম্মান, এত আদর, এত

প্রতিপত্তি, যিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" এই মহাবাক্যের জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাকে ইউরোপীয় মনস্বীগণ প্রাচ্যরাজ্যের হোমর (The Homer of the East) নামে অভিহিত করিয়াছেন, যিনি মহাকাব্য রচনা-মাহাত্ম্যে পারস্য-কবিকুলের শীর্ষস্থলে আসীন, * সময়ের বিবর্ত্তনে যিনি ইংলণ্ডের কবি স্পেন্সার ও ইটালির কবি দান্তের জীবনের অবস্থাভাগী হইয়াছিলেন, চরিত্র-বর্ণনে যিনি কোন কোন স্থলে মিল্টন ও শেক্‌সপীয়র হইতেও সিদ্ধ-হস্ত, যিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-বলে নবরসে গঠিত করিয়া ভুবন-বিখ্যাত শাহ্‌নামার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, (১) সেই পারস্য-কবিকুল-শিরোমণি অমর পুরুষ মহাত্মা ফেরদৌসীর অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবগত হইবার জন্য কাহার না ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিতে পারে?

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ফেরদৌসীর বাল্য জীবনের ইতিহাস সন্তোষজনকরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই; তাঁহার সাহিত্যিক জীবন বৈচিত্র্যময় ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। সেই সকল ঘটনায় কবির অকৃত্রিম স্বদেশ-বৎসলতা, অনুপম উচ্চহৃদয়তা, অমানুষিক তেজস্বিতা, অতুলনীয় ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিপদে অসম সাহসিকতা

* "In epic grandeur he is above all."

(১) জনৈক খ্যাতনামা বঙ্গীয় লেখক ফেরদৌসীকে "আদি রসে তিনি বিদ্যাপতি, বিরহ-বর্ণনায় তিনি ভারত চন্দ্র, এবং করুণ রসে তিনি বাল্মীকি" ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ও কার্য্যতৎপরতার বিষয় বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যদি তিনি ঐ সমস্ত সদ্গুণাধিকারী না হইতেন, যদি তাঁহার অন্তঃকরণ সৎসাহস ও কোমলত্বে সুগঠিত না হইত, তাহা হইলে তিনি পরিণামে এক জন প্রথিতনামা পণ্ডিত বলিয়া কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না এবং সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁহার নির্ম্মল যশের উচ্চ নিনাদে কখনই প্রতিধ্বনিত হইত না। যে সমস্ত অনিবার্য্য ঘটনা পরম্পরায় বিজড়িত হইয়া ফেরদৌসী স্থিরপ্রতিজ্ঞ বীর পুরুষের ন্যায় স্বীয় শুভ সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তৎসমুদয়ের যথাশক্তি বিশ্লেষণ সহকারে তাঁহার শিক্ষাপ্রদ জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্মবৃত্তান্ত ও বিদ্যাশিক্ষা।

কবিকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ফেরদৌসী পারস্যদেশের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশস্থ প্রসিদ্ধ তুস্ নগরের উপকণ্ঠে সাদাব ইয়ারজান নামক পল্লীতে হিজরী ৩৫৮ সালে (৯৪০খৃঃ) জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই জন্য তিনি ফেরদৌসী তুসী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু ফেরদৌসী তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। ইহা তাঁহার

একটী উপাধি মাত্র। একদা গজনীর বিদ্যোৎসাহী অধিপতি অমিততেজা সুলতান মাহ্‌মুদ বিন সবক্তগীন তাঁহার স্বর্গ-সুধা-নিস্যন্দিনী অপূর্ব্ব কবিতামালা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন এবং তদীয় গুণগ্রাহী সভাসদবর্গ তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া কবিকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হন। ইহাতেই গজনীশ্বর মাহ্‌মুদ তাঁহাকে এই "ফেরদৌসী" নামে অভিহিত করেন। ফেরদৌসী শব্দের অর্থ স্বর্গীয়। এইরূপে সুলতান এবং তদীয় অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক তিনি আরও বিবিধ গৌরবান্বিত নামে বিভূষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি ফেরদৌসী নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং অদ্যাবধি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই মনোমোহন আখ্যাতেই পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন।

ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম আবু-অল কাসেম। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বর্দ্ধিষ্ণু ও বিশিষ্ট ধন-সম্পত্তিশালী না হইলেও নিতান্ত অসম্ভ্রান্ত ছিল না; যাহাতে আপনাদিগের শিশুসন্তান শৈশবে সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ করত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয়, এই পরিবারের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ ফেরদৌসীর পিতা মওলানা ফখরদ্দীন আহ্‌মদ এক জন সদ্বিদ্বান, সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন (১)। সমাজে তাঁহার সম্মানও কম

(১) দৌলত শাহ-কৃত "পারসিক কবিদিগের জীবনী" গ্রন্থে ফেরদৌসীর যথার্থ নাম হাসান এবং তাঁহার পিতার নাম ইস্‌হাক বেন শরফ শাহ্‌ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ছিল না। সুতরাং তাঁহার পুত্র যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কালে আশ্চর্য্য শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ কথিত আছে যে, যে দিবস ফেরদৌসী ভূমিষ্ঠ হয়েন, সেই দিন রজনীযোগে তাঁহার পিতা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন (১) সন্দর্শন করেন। সেই স্বপ্নটী এইরূপ,—তিনি নিদ্রাবেশে দেখিলেন, যেন পশ্চিমদিক্ হইতে কি এক অভূতপূর্ব্ব অস্ফুট মধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া অনিল নিঃস্বনে তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই অমৃতবর্ষী ঝঙ্কার অপার্থিব, অতুলনীয় ও অত্যদ্ভুত! তিনি জীবনে কখন সেরূপ ধ্বনি শুনেন নাই, ধরাধামে তাহা সম্ভবে না, বীণাবেণুও সে স্বর জানে না। অনন্তর সেই স্বর-লহরী সহযোগে চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান করিয়া অসংখ্য সাধুবাদ হইতে লাগিল, যেন স্বর্গমর্ত্ত্যে ফুল খেলিতে লাগিল, কি এক মাধুর্য্য-স্রোত বহিয়া গেল। কবির পিতা এই আশ্চর্য্য শুভজনক স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তি সহকারে করুণাময় বিশ্বস্রষ্টার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক দুই হস্ত

এই ইস্‌হাক বেন শরফ শাহ আবার তুস্ নগরের তুস্ নাম্নী নদীর একটী শাখা-প্রবাহের তীরস্থিত কোন ফলোদ্যানের মালীর কার্য্য বা অধ্যক্ষতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কথিত আছে, এই উদ্যানের নাম ফেরদৌস্ ছিল। প্রতি বৎসর প্রবাহের জলপ্লাবনে ইহার উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত এবং তদ্দ্বারা বৃক্ষরাজি সতেজ ও ফল-পুষ্পান্বিত হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিত। এই উদ্যানের সহিত সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন ফেরদৌসীর পিতাও নাকি আপনাকে ফেরদৌসী নামে অভিহিত করিতেন। কিন্তু এই মত যে কতদূর সমীচীন, বিজ্ঞমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন।

(১) জগতের মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বসূচী স্বরূপ এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সেই সমস্ত ঘটনার অধিকাংশ যে অনেক স্থলে সত্যমূলক, তাহার আর সংশয় নাই।

তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার নয়ন-পল্লব আর নিমীলিত হইল না, তিনি শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ত্রিযামার অবশিস্ট সময় জাগ্রৎ অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষ-কালে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্বপ্নের ফলশ্রুতি বাসনায় কোন শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। এই ব্যক্তি ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও গভীর তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ফেরদৌসী-জনককে সম্বোধন করিয়া প্রফুল্ল-বদনে কহিলেন "কোন চিন্তা নাই; স্বপ্নের ফল অতি সন্তোষ-জনক। যে সুকুমার শিশু শুভ লগ্নে আপনার গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে, কালক্রমে তাহার সুবিমল যশো-শশধরের সমুজ্জ্বল প্রভায় বিশ্বভূমণ্ডল প্রতিভাসিত হইবে। জগদীশ্বরের কৃপায় সে এক জন শ্রেষ্ঠ কবি হইবে, তাহার নিরুপম কাব্যামৃত পানে মানবগণ তৃপ্তিলাভ করত চিরদিন তাহার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিবে, আপনি ধন্য হইবেন।"

এই শুভজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার আনন্দের সীমা রহিল না; আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; উচ্চাশায় বুক ভরিয়া গেল, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা তাঁহার বদনমণ্ডলে ক্রীড়া করত লাবণ্য বিকাশ করিয়া দিল। আজ যেন তিনি কত ধনরত্ন, কত মণি-মাণিক্য—কত রাজ্য-সম্পদ লাভ করিলেন। না করিবেনই বা কেন? জগদীশ্বরের প্রসাদে আজ তিনি যে চিরানন্দদায়ক গুণবান্ পুত্র প্রাপ্ত হইলেন, মণিমাণিক্য কি? মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার হইতেও কি তাহা শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয় নহে?

রাজ্য-সম্পদ হইতেও কি তাহা গরিষ্ঠ নহে? ধনধান্য চিরস্থায়ী হয় না, বিপুল বিত্তশালী ধরাধিপতিও ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে কপর্দ্দক-শূন্য ভিখারী হইতে পারেন। কিন্তু যে ধন সুদুর্লভ, যাহা করুণাময় বিধাতা পুরুষ কৃপা বিতরণে দান না করিলে কেহ সহস্র প্রযত্নে—অখিল বসুন্ধরার বিনিময়েও আয়ত্ত করিতে সমর্থ নহেন, সেই অবিনশ্বর ধনাধিকারী যাঁহার পুত্র, সেই পিতার হৃদয়ে সহস্র ধারায় আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত না হইবে কেন? ফলতঃ এ জগতে ঈদৃশ সৌভাগ্য যে অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অতঃপর ফেরদৌসীর পিতা মওলানা ফখরুদ্দীন আহ্‌মদ স্বপ্নভাষিত উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরমযত্নে সেই নবজাত সুকুমার শিশুর লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন। স্নেহময়ী জননীর কোমল হস্তের গঠনে ও বিচক্ষণ পিতার অক্লান্ত তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে কুমার শুক্ল পক্ষের শশী-কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যথাকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ নিয়োজিত করা হইল। স্বয়ং মওলানা সাহেব পুত্রের শিক্ষাগুরু স্থানীয় হইলেন। সুতরাং শিশুর প্রকৃতিগত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষার সহিত অবিরাম গতিতে তদীয় শিক্ষাকার্য্য চলিতে লাগিল। ক্রমে যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে চলিল, ফেরদৌসীর শিক্ষানুরাগ ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিনী প্রতিভাবলে ও বিজ্ঞ পিতার সুপ্রণালীবদ্ধ শিক্ষাদান-পদ্ধতি-প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সর্ব্ব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করত

অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বিচক্ষণতার উৎকর্ষ ক্রমশই সংসাধিত হইতে লাগিল। কেননা তিনি প্রবল জ্ঞানার্জ্জন-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সাহিত্যালোচনায় ও প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস-চর্চ্চায় সমধিক মনোনিবেশ করিলেন। তাহাতে তাঁহার আসক্তি এরূপ বলবতী ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল যে, তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার সময়ের অধিকাংশ ভাগ সেই সুখজনক কার্য্যেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; শত বিঘ্ন অথবা কোন আকস্মিক প্রতিবন্ধক তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিত না।

তুস্ নগরের পাদদেশে তন্নামীয় নদীর একটী শাখা-প্রবাহ প্রবাহিত ছিল। প্রতি বৎসর বর্ষা সমাগমে তাহার জলরাশি স্ফীত হইয়া তীরবর্ত্তী পল্লী সমূহ ও সমগ্র তুস্ নগর প্লাবিত করিত। তাহাতে নগরবাসী জন-সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও সমূহ ক্ষতি হইত, বিশেষতঃ দরিদ্র অধিবাসীদিগের দুর্গতির ইয়ত্তা থাকিত না। জলপ্লাবনে বহু গৃহ ভূপতিত হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইত, কত জন নিরাশ্রয় ও নিরন্ন হইয়া অশ্রুবিগলিত-নেত্রে পথে পথে বিচরণ করিত। শস্যক্ষেত্র ও ফলোদ্যান শ্রীভ্রষ্ট ও ফলশূন্য হইত; পশুপাল খাদ্যাভাবে পীড়িত, কতক বা প্রবল জল-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া গৃহস্থের অপচয় সাধন করিত। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, রাজ্যাধিপতি বা রাজ-প্রতিনিধির আদৌ সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। প্রজার প্রাণরক্ষার্থে সর্ব্বথা যত্ন করা যে রাজধর্ম্মের একটী শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ, তাহা তাঁহারা ভ্রমেও

মনে করিতেন না। অগত্যা জন-সাধারণ আত্মরক্ষার্থে সমবেত চেষ্টায় প্রতিবৎসর যথাস্থলে কাঁচা বাঁধ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু হায় প্রবল সলিল-স্রোতের সম্মুখে তাহা কতক্ষণ অক্ষুণ্ণ ও স্থির থাকিতে পারে? তরঙ্গ-প্রহার-প্রভাবে তাহা অচিরায় ভগ্ন ও উৎসাদিত হইয়া নগরকে জলমগ্ন করিত। নগরের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে ও নগরবাসী বাল-যুব-বৃদ্ধ নরনারীর ত্রাহি ত্রাহি করুণধ্বনি শ্রবণে কোমল-হৃদয় ফেরদৌসীর কোমল মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই সেই দৈব বিপৎপাত নিবারণার্থ বিজনে চিন্তা করিতেন। ভাবিতেন, "দয়াময় বিধাতার অনুগ্রহে এমন কোন একটী কৌশল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যৎপ্রভাবে এখানে একটী প্রস্তরময় সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা নগরবাসীগণ জলপ্লাবন-জনিত দুর্দ্দশা হইতে চির অব্যাহতি লাভ করে। আহা বিধাতা কি এরূপ অনুগ্রহ করিবেন? এরূপ সৌভাগ্য কি হইবে? যদি তাহা ঘটে, তবেই আমার মর্ম্মপীড়া প্রশমিত হইবে, তবেই আমার হৃদয়ের বেদনা বিদূরিত হইবে।" পাঠকগণ বলিতে পারেন যে, ইহা নিরুপায় জনের অলীক কল্পনা, সাধ্যাতীতের সোণার স্বপ্নসন্দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সত্য বটে, দরিদ্রের মহৎ কার্য্যের সঙ্কল্প, সঙ্কল্পেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সুকঠিন, সত্য বটে, যখন কোন কার্য্য শক্তির অতীত বলিয়া অনুমিত হয়, এবং তাহা দুরূহ জানিলেও যদিই কাহার অন্তরে তৎসম্পাদন-বাসনার উদ্রেক হয়, তবে তখন তিনি

আকাশে কুসুমোদ্যান রচনার ন্যায় স্বভাবতঃ নানা অসম্ভব চিন্তার অবতারণা করেন, কিন্তু তাহা যে সকল স্থলেই নিস্ফল, নিরর্থক ও অসম্ভব হইয়া থাকে, তাহা কখনই নহে। যিনি ক্ষণেকের জন্য স্বীয় সঙ্কল্প-সাধন-চিন্তা করিয়া তাহা চিরপরিত্যাগ করেন, যাঁহার অন্তরে সে চিন্তা বিদ্যুৎ-প্রভাবৎ উদিত হইয়া মুহূর্ত্তে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহার পক্ষে একথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যিনি তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত বীরের ন্যায় স্থিরচিত্তে নিরন্তর নিমগ্ন থাকেন, যাঁহার অস্থি-মজ্জা-ধমনীতে তদীয় কামনার ঘাত-প্রতিঘাত অবিরাম অনুভূত হয়, তিনি—হউন অতি দরিদ্র, হউন নিরুপায় ও নিরবলম্বন—পরিণামে যে সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, তাঁহার শ্রান্ত হৃদয়ে শান্তি ও ম্লান বদনে যে আনন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। মহামতি ফেরদৌসী এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। তিনি দরিদ্রের সন্তান এবং দরিদ্র, তাঁহার শক্তি অতি ক্ষুদ্র, ইহা তিনি স্বয়ং জানিয়াও দুরূহ বাঁধ-নির্ম্মাণ বাসনায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল ও বলবতী হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণভাবে বলিতেন "যদি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে কখন আশানুরূপ ধনোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হই, তবে এই নিদারুণ ক্লেশের হাত হইতে নগরবাসী প্রজা-সাধারণকে রক্ষা করিব,—প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা নদীতটে এরূপ এক সুদৃঢ় ও সমুন্নত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে, বর্ষায় জলরাশি সহস্র গুণে উচ্ছ্বসিত

হইলেও যেন নগরে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে।” দরিদ্র ফেরদৌসী মহতের উচ্চাভিলাষ,— এই শুভ সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শাহ্নামা গ্রন্থোৎপত্তির মূল সূত্র।

প্রাচীন ইতিবৃত্তকারদিগের লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পারস্যের সাসানীয় বংশের ভুবনবিখ্যাত ন্যায়বান্ নরপতি নওশেরোয়াঁ অতীব দয়ালু, বিচক্ষণ, বদান্য ও বিদ্বান ছিলেন। নিরপেক্ষ বিচার ও শৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্য-শাসন প্রভাবে তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। সেই মনস্বী মহীপাল প্রাচীন ইরাণ (পারস্য) সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববতন ভূপালগণের জীবন-বৃত্তান্ত, কীর্ত্তি-কলাপ, শাসন-প্রণালী এবং রাজ্য-সংক্রান্ত উপাখ্যান ও অপর ঐতিহাসিক ঘটনা জানিতে অতীব আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি প্রভূত প্রয়াস স্বীকার করিয়া তৎসমূহের যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পৃথক পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ করাইয়া আপনার পুস্তকাগরের রক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার রাজত্বের দীর্ঘকাল পরে

এজ্‌দ্‌জোর্দ্দ (১) নামক জনৈক সদ্‌গুণশালী ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি পারস্যের সিংহাসনারোহণ করেন। তিনিও নরপতি নওশেরোয়াঁর ন্যায় প্রাচীন রাজোপাখ্যান ও ইতিবৃত্ত অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি রাজকীয় পুস্তকালয়ে নওশেরোয়াঁ-সংগৃহীত প্রত্নতত্ত্ব সমূহ খণ্ড খণ্ড রূপে রক্ষিত দর্শনে, তৎসমুদয় একত্রে লিপিবদ্ধ করিতে অভিলাষ করেন। তদনুসারে দান্‌সুর দহ্‌কান নামক জনৈক দূরদর্শী পণ্ডিতের উপর তৎকার্য্যের ভারার্পিত হয়। তিনি রাজানুমতিক্রমে বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত পারস্যরাজ কয়ুমর্সের রাজত্বকাল হইতে মহারাজ খস্‌রুর সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নাম সায়ের উল মুলুক বা বোস্তাঁনামা।

বোস্তাঁনামা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর যখন ধর্ম্মবলদৃপ্ত পরাক্রান্ত আরবীয়গণ অদ্বিতীয় তেজোবীর্য্যশালী দ্বিতীয় খলিফা মহামতি ওমর ফারুখের নেতৃত্বাধীনে পবিত্র ইস্‌লামের উন্নতি ও বিস্তৃতি মানসে জ্বলন্ত উৎসাহে ও অপ্রতিহার্য্য প্রতাপে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন, সেই সময়ে এই গ্রন্থ লুন্ঠিত দ্রব্যাদির সহিত আরবভূমে নীত হয়। পরবর্ত্তী কালে ইতিহাসপ্রিয় মুসলমানগণের নিকট এই গ্রন্থের আদরের সীমা ছিল না। ইহা আরবী ও অপর

(১) এজ্‌দ্‌জোর্দ্দ ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নওশেরোয়াঁর শেষ বংশধর, হিজরীর প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে রাজত্ব করিতেন। ইঁহা হইতেই পারস্যে সাসানীয় কুলের

কয়েকটী ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল এবং আরব হইতে ক্রমান্বয়ে ইথিয়োপিয়া বা হব্‌শ (১), ভারতবর্ষ ও খোরাসান প্রদেশে আসিয়াছিল। যৎকালে ইয়াকুব বেন্‌ লেস্ (২) খোরাসানের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদ অধিকার করেন, তখন তিনি ইরাণপতি এজ্‌দ্‌-জোর্দ্দের পরবর্ত্তী ভূপালগণের হস্ত হইতে কিরূপে রাজ্য-সিংহাসন হস্তান্তরিত হয়, তদ্‌বৃত্তান্ত বিশেষ যত্নের সহিত সংগ্রহ ও সঙ্কলন পূর্ব্বক বোস্তাঁনামার সহিত সংযোগ করত সেই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেন। এই কার্য্য হিজরী ৩৬০ সালে সম্পাদিত হয়। কালক্রমে খোরাসান-রাজ্য সামানী রাজগণের

রাজত্বের অবসান হয়। ইনি আরবের অমিত পরাক্রমশালী দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা ওমর ফারুখ-প্রেরিত বিজয়-বাহিনী কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন।

(১) ইথিয়োপিয়া বা হব্‌শ—আবিসিনিয়া ও পূর্ব্বসূদান রাজ্য হব্‌শরাজ্যের অধিবাসীদিগকে হাব্‌শী বলে। হাব্‌শীরা কৃষ্ণবর্ণ ও কুশ্রী। এই রাজ্যের বিচক্ষণ নরপতি নজ্যাসি ইস্‌লামের প্রথমাবস্থায় তদ্ধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

(২) লেস্‌ সামান্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপুত্র ইয়াকুবও প্রথমে সেই কার্য্যে নিয়োজিত হন। কিন্তু তিনি বাল্যে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা তদীয় সহচর বালকগণের নিমন্ত্রণেই ব্যয়িত হইয়া যাইত। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত ও বলিষ্ঠ হইলে তিনি লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই সময়ে তাঁহার অধীনে বহু দুর্দ্দান্ত লোক সমবেত হয়। অতঃপর ইয়াকুব প্রকৃতই একটী সৈন্যদলের নেতা হইয়া প্রথমে শিস্তান, পরে খোরাসানের আধিপত্য লাভ করেন। বোগদাদের মহামান্য খলিফা তাঁহার তেজস্বিতা ও রণনৈপুণ্যের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে বল্‌খের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এই উচ্চ পদারূঢ় হইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে কাবল (?), হেরাত, নেশাপুর, তব্‌রেজস্তান, প্রভৃতি জয় করত অবশেষে পারস্য গ্রহণ পূর্ব্বক খলিফার রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পীড়িত ও মৃত্যু মুখে পতিত হন।

হস্তগত হইলে তদ্বংশীয় জনৈক বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যপ্রিয় নরপতি তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি দকিকীকে এই গ্রন্থ কাব্যাকারে রচনা করিতে অনুমতি করেন। কবিবর দকিকী রাজাজ্ঞায় হৃষ্টচিত্তে গ্রন্থপ্রণয়নে মনোযোগী হয়েন। কিন্তু তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে শীঘ্রই সহস্র কবিতা রচনা করার পর, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ আপনার দুর্বৃত্ত পরিচারক কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, গ্রন্থ-রচনা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়,—বহুকাল যাবত অপর কেহই উক্ত দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

অনন্তর অদ্বিতীয় তেজোবীর্য্যশালী দিগ্বিজয়ী ভূপতি সুলতান মাহ্‌মুদ বিন সবক্তগীন,—যিনি সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি হইবার উচ্চাভিলাষে সুদূরবর্ত্তী তাইগ্রীসের উপকূল ভাগ হইতে নির্ম্মল-সলিলা গঙ্গা নদীর শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূমি পর্য্যন্ত এবং তাতারের তুষার-ধবলিত উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা হইতে ভারতমহা-সমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন,—ইতিবৃত্ত-শ্রবণ-লালসা পূর্ণ এবং স্বীয় রাজত্বের গৌরব বৃদ্ধি অভি-প্রায়ে পারস্য দেশীয় প্রাচীন রাজাদিগের এক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি স্বয়ং সুধী, সুবিদ্বান ও প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিদ্বানেরও অতিশয় সম্মান করিতেন। গুরুতর রাজ্য-শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও বিদ্যালোচনারূপ বিমলানন্দ উপভোগে তাঁহার অনবকাশ ঘটিত না। তজ্জন্য তাঁহার রাজসভা অনেক বিখ্যাত কবি এবং পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা

সুশোভিত ছিল। তিনি স্বীয় সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করণার্থ সেই সমস্ত সুধী পুরুষকে অনুমতি করেন। তাঁহারা যৎকালে এক যোগে এই বহু শ্রমসাধ্য কঠিন কার্য্য সম্পাদনার্থ ইতিবৃত্ত-মূলক ঘটনা পরম্পরার সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে দৈব-ক্রমে এক খণ্ড বোস্তাঁনামা সুলতান মাহ্‌মুদের হস্তগত হয়। গুণগ্রাহী সুলতান সেই অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব আশানুরূপ তথ্য-পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত ও অত্যন্ত পুলকিত হয়েন এবং তন্মধ্য হইতে সাতটী বিষয় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সাত জন রাজকবিকে কাব্যাকারে রচনা করিতে প্রদান করেন। সুলতানের উদ্দেশ্য—কবিসপ্তমের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গুণবান্, ছন্দ-পারিপাট্যে, শব্দবিন্যাসে ও রচনা-মাধুর্য্যে যাঁহার প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইবে, তিনি তাঁহারই উপর গ্রন্থ-প্রণয়নের ভারার্পণ করিবেন। কবিবৃন্দ যথাকালে আপনাপন রচনা সুলতান সমীপে উপস্থিত করিলে তিনি অবহিতচিত্তে তৎসমুদয় পাঠ করত পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষাস্থলে রাজকবি আন্‌সারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তিনি রোস্তম ও সোহ্‌রাবের উপাখ্যান এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, সুলতান মাহ্‌মুদ তদীয় অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সুচারু লিপিকুশলতায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকেই সমগ্র গ্রন্থ রচনা করিতে নিয়োজিত করিলেন।

এই সময়ে আমাদের মহাকবি ফেরদৌসী জন্মভূমি তুস্ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখনও তাঁহার সুরভিত

কবিতা-কোরক সম্যক্ বিকশিত হয় নাই বটে, কিন্তু স্ফুটনোন্মুখ হইতেছিল, তখনও তাঁহার মধুময়ী বীণার মনোমোহন ঝঙ্কার দিগ্ দিগন্তর মাতাইয়া. বিমানপথে উত্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু উত্থানের উদ্যম করিতেছিল। তিনি সেই নিভৃত নগরের নিভৃত ভবনে থাকিয়া আত্মতৃপ্তি সাধনার্থ সমধিক যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কবিতা দেবীর সেবায় এবং কিরূপে বাঁধ-বন্ধন করিয়া নগরবাসীদের ক্লেশ নিবারণ করিবেন, তৎচিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে সৌভাগ্যসূত্রে অবগত হইলেন যে, গজনীর বিদ্যোৎসাহী মাহামান্য সুলতান মাহমুদ-বিন্ সবক্তগীন পুরাকালের বাদশাহ-গণের জীবনের কার্য্যকলাপ ঘটিত কোন এক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করাইতে অভিলাষ করিয়াছেন এবং সেই সুমহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গজনীরাজসভায় নানাদিগ্‌দেশ হইতে অনেকানেক ধীশক্তিসম্পন্ন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবির আগমন হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে ফেরদৌসীর অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল, তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল উৎসাহের উজ্জ্বলালোকে বিভাসিত হইল, কুহকিনী আশার মোহনীয় মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি স্বয়ং ঐরূপ এক গ্রন্থ কাব্যাকারে প্রণয়ন পূর্ব্বক তৎলব্ধ অর্থের দ্বারা বাঁধ বন্ধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কোন পুস্তক হস্তগত না হওয়ায় সঙ্কল্পসিদ্ধি বিষয়ে অযথা বিলম্ব ও ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। এই নিমিত্ত তিনি অতি বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু

অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর, মহাম্মদ লস্করী নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু হইতে তাঁহার এই ভীষণ চিন্তা অপনীত হয়। তিনি সেই পরম মিত্রের নিকট উক্তবিধ এক পুস্তক পাইয়া পাঠ করত প্রফুল্লমনে অদম্য উৎসাহে কার্য্যারম্ভ করিলেন। মহাকবি প্রথমে ইরাণপতি জোহাক ও ফেরিদুঁ বাদশাহের যুদ্ধ-বিবরণ সুধাময়ী তেজস্বিনী ভাষায় রচনা করিলেন এবং তাহাতেই অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠাবান হইলেন; আপামর সাধারণ তাঁহার অভিনব কাব্য পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। সেই রচনা এতই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষণী হইয়াছিল যে, তাহার শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য ও অলৌকিক কবিত্বশক্তি দর্শনে খোরাসানের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আবু মন্‌সুর অতীব প্রীতিলাভ করেন। তিনি কবিবর ফেরদৌসীকে আগ্রহের সহিত আহ্বান করিয়া আনিয়া পুরস্কার প্রদানে উৎসাহিত ও সম্মানিত করিলেন এবং রাজপ্রাসাদে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে অনুমতি দিলেন। ফেরদৌসী রাজাশ্রয়ে পরমসুখে থাকিয়া পুস্তক লিখিতে আদিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই অদৃষ্ট তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিল, তাঁহার পরমহিতৈষী আশ্রয়দাতা কাব্যামোদী আবু মন্‌সুর অকস্মাৎ মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন। তখন মহাকবি আবার বিষাদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন, হতাশে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। তিনি নয়নে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন ? নিরুপায় ! অগত্যা তাঁহার লেখনীও মহাক্ষোভে কিছুকাল অচল ভাব ধারণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কবির গজনী যাত্রা ও পথিমধ্যে ব্যাঘাত প্রাপ্তি।

ফেরদৌসীর গুণগরিমা এক্ষণে চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার নবজাত কাব্য-কাননের সুরভিত সমীরণ দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেছে। দীনের কুটীরে, মধ্যবিত্তের ভবনে, ধনীর সৌধে, রাজার প্রাসাদে আজ ফেরদৌসী সমভাবে বিদ্যমান—সর্ব্বত্রই শতমুখে তাঁহার নির্ম্মল যশোগীতি কীর্ত্তিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এতদপেক্ষা কবির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? গজনীপতি সুলতান মাহ্‌মুদও তাঁহার অনন্যদুষ্কর কবিত্ব-শক্তির প্রশংসাবাদ ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ অবধি তিনি সেই অতুলনীয় কীর্ত্তিমান্ অমর কবিকে রাজধানী গজনীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া আপনার রাজসভা সমালঙ্কৃত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ সমুপস্থিত। সুলতান কবিবর ফেরদৌসীকে গজনী-রাজসভায় পাঠাইয়া দিবার জন্য খোরাসানের শাসনকর্ত্তাকে অনুজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন। ফেরদৌসী সেই লিপির মর্ম্মাবগত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধির মাহেন্দ্র-যোগ উপস্থিত জ্ঞানে পরম পুলকিতান্তরে বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর আত্মীয়-বান্ধবের নিকট বিদায় লইয়া আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্ব্বক অগৌণে গজনী যাত্রা করিলেন।

মহাকবির গজনী-গমন ও তাঁহার জন্মভূমিতে অবস্থান কালের বিবরণ সম্বন্ধে নানা জনে নানা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ বলেন, ফেরদৌসীর পরমহিতৈষী আশ্রয়দাতা আবু মন্‌সুরের পরলোক গমনান্তে যিনি খোরাসান প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদাভিষিক্ত হন, তাঁহার অত্যাচার বশতই কবি বাসভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আবার পুস্তকান্তরে এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। যদিও তাহা যথার্থ বলিয়া প্রামাণ্য নহে, ন্যায়দর্শী জগৎ তাহা সম্ভব ও সমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহেন, এবং আমরাও তাহার পক্ষপাতী নহি, তথাপি সেই বৃত্তান্ত সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কবিবর ফেরদৌসী এবং তাঁহার সহোদর মহ্‌মুদ মূলে তুস্ নগরের জনৈক কৃষক-সন্তান ছিলেন এবং উভয়েই শ্রমসাধ্য কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ঘটনাক্রমে কোন প্রতিবাসীর সহিত তাঁহাদের ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেই প্রবল শত্রুর ভীষণ প্রপীড়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া অনুতপ্ত-চিত্তে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তদনুসারে তিনি একদা বিনয় ও কাতরতার সহিত ভ্রাতার নিকট আপনার মনের ভাব প্রকাশ করেন; বলেন "ভ্রাতঃ! শত্রুর অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত এত উৎপীড়ন, এত অত্যাচার, এত অবমাননা সহ্য করিয়া আর বাস করা যায়

না। পদে পদে শত্রু-ভয়, পদে পদে বিড়ম্বনা, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেও আশঙ্কা উপস্থিত হয়। হয় তো কোন্ দিন বা জীবনের আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। রক্তমাংসময় দেহধারী মানবের পক্ষে একথা কি মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষাও ভীষণতর নহে? হায় আমরা অতি দীন—শক্তিহীন, সুতরাং প্রতীকার কোথায়? দুর্ব্বলের পক্ষ-সমর্থন করিবে কে? অতএব যেখানে অত্যাচারের প্রতীকার নাই, সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্য নাই, কাহার সহানুভূতি বা সাহায্য পাইবার উপায় নাই, যে স্থলে আহার, বিহার, নিদ্রা বা জাগরণে সতত সন্ত্রস্তচিত্তে কালক্ষেপ করিতে হয়, সেই স্থলে কোন্ সুখে অবস্থান করিবেন? আমার বিবেচনায় সেস্থলে আর কোনক্রমেই বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সেই স্থলে থাকা, আর শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে অবস্থিতি করা, উভয়ই সমান। তাই বলিতেছি, যদি জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্ব্বিঘ্নে শান্তিসুখে কাটাইতে বাসনা করেন, তবে চলুন, আমরা উভয়েই এই অশান্তিময় অরাজক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শান্তিপূর্ণ রাজ্যে প্রস্থান করি।"

মহ্‌মুদ ভ্রাতার প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন, কিন্তু প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু সে বিষয়ে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া এবং ভ্রাতাকে বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিয়া প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে লাগিলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফেরদৌসী কিছুতেই বিচলিত হইলেন না; তিনি স্বদেশের মমতা

ও ভ্রাতার স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী আত্মীয়-বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় সাশ্রুনেত্রে বাল্যকালের লীলা-নিকেতন জন্মস্থান তুস্ নগর হইতে গজনী অভিমুখে বহির্গত হইলেন।

এ জগতে শুভ কার্য্যের অন্তরায় অনেক! শুভর পশ্চাতে অশুভ আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতিনিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। তুমি বুঝিতে পারিবে না, জানিতে পারিবে না, দেখিতে পাইবে না, তোমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোন্ এক সূত্রে অনিষ্টের ভীষণ জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কে বলিতে পারে, কখন্ কৌমুদী-বিধৌত নির্ম্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইবে? যখন কবিপ্রবর ফেরদৌসীকে তুস্ নগর হইতে গজনী রাজধানীতে প্রেরণার্থ খোরাসানের শাসনকর্ত্তাকে পত্র লিখিত হয়, * সেই সময় বদরউদ্দীন নামক জনৈক সভাসদ স্থলতান-দরবারে উপস্থিত ছিলেন। বদরউদ্দীনের সহিত অন্যতম রাজকবি আন্সারী ও রুদকীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বন্ধুদ্বয়ের মঙ্গল-কামনায় গোপনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "দেখিতেছ কি, তোমাদের সৌভাগ্য-শশী তমসাবৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তুস্ নগরে জনৈক অলৌকিক গুণসম্পন্ন প্রসিদ্ধ কবি আছেন, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অতুলনীয়। সম্রাট তাঁহাকে গজনীতে আনয়নার্থ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া শাহ্‌নামা প্রণয়ন

* পাঠকগণ! কবির গজনী-গমনের প্রথম বৃত্তান্ত স্মরণ করুন।

পূর্ব্বক বাদশাহের অনুগ্রহ-ভাজন এবং চিরদিন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা তোমাদের আশা-ভরসা বিলুপ্ত এবং ভাবী উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তোমরা আমার পরম বন্ধু। বন্ধুর ক্ষতিতে বন্ধুর অন্তরে আঘাত লাগে। এই জন্যই আমি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। যদি আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার রাখিতে চাও, যদি রাজানুগ্রহ লাভে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করিতে শৈথিল্য করিও না।” কবিদ্বয় সহসা এই অশিব সংবাদ শ্রবণে অতীব চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভাবী অনিষ্টের বিষয় ভাবিয়া মুখ মলিন—হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। কি করিবেন? ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। ফলে বুঝিলেন, তুসীয় কবির আগমন প্রতিরোধ করাই তাঁহাদের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। কিন্তু কিরূপেই বা সেই আগমনোন্মুখ পুরুষকে নিরস্ত করা যায়! কোন্ পথ অবলম্বন করিলে—কোন্ হেতু দর্শাইলে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইতে পারে? কাহার স্কন্ধে দুইটা মস্তক আছে—কে এমন অমিত সাহসশীল যে, তুসীয় কবির গজনী আগমনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া সুলতান সমীপে প্রস্তাব উত্থাপন করে!! পরন্তু এ কার্য্য না করিলেও শুভ নাই। এইরূপ বিবিধ চিন্তায় জড়ীভূত হইয়া—বহুল গবেষণা করিয়া অবশেষে কবিযুগল তুসীয় কবির নিকটে জনৈক সুচতুর প্রিয়ভাষী চর প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। চর

কবিদ্বয়ের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে হিরাতের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে মহাকবির সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। তখন কৌশলী চর কবির সহিত বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। যখন ফেরদৌসীর গজনী-গমন ও সুলতানের বিদ্যানুরাগিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তখন তিনি কবিদ্বয়ের শিক্ষানুযায়ী সংপূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কৌশলজাল বিস্তার করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মহাশয়! শুনিয়াছি, সুলতানের মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রন্থ রচনায় যে অনুরাগ—যে বিদ্যোৎসাহিতা ছিল, তাহা আর নাই, সে উৎসাহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন তিনি ধনী-জন-সুলভ বিলাস-ব্যসনেই দিনপাত করিতেছেন। আপনি যে আশায় উৎসাহিত হইয়া পদব্রজে এই সুদীর্ঘ পথ কষ্টে অতিক্রম করিতেছেন, আপনার সে পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই—যাইলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অতএব আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে স্থলে না যাওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। আপনি যে ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। আমি প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন।"

মিষ্টভাষী চতুর চর ঐ সমস্ত কথা এরূপ কৌশলের সহিত, এরূপ মধুর বাক্যে ব্যক্ত করিলেন যে, সরলচেতা ফেরদৌসী তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। কেননা

সেই সুদূরবর্ত্তী অপরিচিত স্থানে বৈদেশিকের প্রতিকূলে বিপক্ষ প্রতারণা-জাল পাতিবে, কে তাহা মনে করিতে পারে? তাই শুদ্ধমতি ফেরদৌসীর অন্তরে সন্দেহের রেখাপাত মাত্র হইল না। কিন্তু শ্রবণমাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল হতাশে মলিন ভাব ধারণ করিল, অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। তিনি ভীষণ মর্ম্মাহত হইলেন। কে যেন সহসা তাঁহাকে বজ্রপ্রহারে ভূপাতিত করিল। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে ভাবিলেন—রাজাদের মন, মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইবার কথাই বটে! কিন্তু যত দোষ আমার ভাগ্যের; ভাগ্যে সুখ নাই, দোষ দিব কাহার? বিধাতা ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডনীয় নহে। আবার ভাবিলেন,—আগন্তুক ব্যক্তি সংপূর্ণ অপরিচিত। তাহার ইহাতে কোন স্বার্থ আছে কি না, জানি না। কিন্তু সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক কথা বলিয়াছে। তাহার অনেক কথা বলিবার কারণ কি আছে? আর ইহার বাক্য যে বাস্তবিকই সত্য, তাহারই বা প্রমাণ কি? ফলতঃ এক জন অপরিচিত আগন্তুকের বাক্যে সহসা আস্থা স্থাপন করাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।" এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া কবি-প্রবর অবশেষে কর্ত্তব্য অবধারণার্থ নিকটস্থ এক পান্থশালায় কিছুদিন অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তখন চর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থানপর হইলেন।

ফেরদৌসী চিন্তিতচিত্তে পান্থনিবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘটনাসূত্রে কবি আন্‌সারি ও রুদকীর সহিত বদর-

উদ্দিনের মনোমালিন্য জন্মিল। পূর্ব্বে তিনি বন্ধুত্বের অনুরোধে যে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার চক্ষে অতীব অন্যায় ও অপকর্ম্ম বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; ভয়ানক অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর পুড়িতে লাগিল এবং তৎসহ ভয়েরও উদ্রেক হইল। ভাবিলেন, "পৃথিবীতে কোন কার্য্যই গুপ্ত থাকে না; যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহা এক দিন না এক দিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং কোন রূপে যদি তুসীয় কবির আগমনে বাধা প্রদানের ষড়যন্ত্র বাদশাহের কর্ণগোচর হয় এবং তাহাতে আমি লিপ্ত আছি, জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না—প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। সাধ করিয়া সুখে বঞ্চিত হইতে কে চাহে? অতএব অবিলম্বে ইহার বিহিত বিধান করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সেই কবি সত্বর রাজধানীতে আগমন করেন, তাহার উপায় করিতে হইতেছে।" সন্তপ্ত বদরউদ্দিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ফেরদৌসীকে আহ্বানার্থ গুপ্তভাবে পান্থনিবাসে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যথাকালে তথায় উপনীত হইয়া কবির নিকটে আদ্যোপান্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন ফেরদৌসী, কবি আন্‌সারী -ও রুদকীর বিজাতীয় ব্যবহার ও বৈরিতার কথা অবগত হইয়া যুগপৎ বিষাদিত ও হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে দূতের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—এই অভ্যাগত ব্যক্তির প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল,

জানিতাম না, শিক্ষিত লোকের প্রবৃত্তি এত হীন—এত ঘৃণ্য হইতে পারে! জানিতাম না, সে স্বার্থের বশে এত দূর নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারে!! হায় তবে আর শিক্ষার গৌরব কি রহিল? শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রভেদ কি রহিল? বুঝিলাম, স্বার্থ বিশ্ববিজয়ী! জগতের ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র, ইতর, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই সময়ে স্বার্থের পদসেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। কি ঘোর বিড়ম্বনা!! যাহা হউক, পান্থনিবাসে অবস্থান করাই আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এস্থান পরিত্যাগ করিলে এই আগন্তুকের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিত না এবং এই শুভ সংবাদ জানিবারও উপায় হইত না। এক্ষণে আর এখানে কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, অভিলষিত পথের অনুসরণ করা যাউক। এবংবিধ চিন্তার পর মহামতি ফেরদৌসী সর্ব্বকার্য্যের অধিনায়ক সেই বিশ্বস্রষ্টা পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গজনীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গজনীরাজকবিগণের সহিত ফেরদৌসীর কাব্যালাপ ও তাঁহাদের সহিত অবস্থান।

অপার উৎসাহের আকর্ষণ-বশে অক্লান্ত পরিশ্রমে দিবা রজনী চলিয়া ফেরদৌসী গজনী নগরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। তিনি দূর হইতে রাজধানীর রমণীয় শোভা-সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত ও পরম পুলকিত হইলেন। রাজপ্রাসাদ, তোরণশ্রেণী, সাধারণ হর্ম্ম্যমালা, মস্‌জিদ, মিনার, দুর্গ এবং অপরাপর দর্শনীয় বিষয়ের সৌন্দর্য্যে ও অভিনবত্বে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চক্ষে গজনী নগরী সুখধাম সুরপুরী বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার নয়ন-মন ততই পরিতৃপ্ত ও চতুর্দ্দিকের বহু বাহ্য দৃশ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর ফেরদৌসী মনে মনে সুলতান মাহ্‌মুদের শাসনশক্তি ও বিদ্যাচর্চ্চা এবং নগরবাসীদের সুখসৌভাগ্য প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে যথাকালে নগরীর উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন, এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে পথপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে আন্‌সারী, আস্‌জদী ও ফর্‌রখী, গজনীর এই প্রতিষ্ঠাবান রাজকবিত্রয় ভ্রমণার্থে নগর বহির্ভাগে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অদূরে এক

রাজকীয় কুসুমোদ্যান মধ্যে সুরভিত সুশীতল মারুত-হিল্লোলে উপবেশন করিয়া নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করত আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। ফেরদৌসী তাঁহাদের নিকটে গমনাভিলাষে গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। তাহাতে কবিত্রয়ের মনে বড়ই অসন্তোষ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইল। সেই অপরিচিত পুরুষকে আসিতে দেখিয়া এক জন ভ্রূ-ভঙ্গিমা সহকারে কহিলেন, "এমন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের সময়ে অপরের সহিত বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ করিতে প্রাণ কিছুতেই প্রস্তুত নহে। আগন্তুক আসিলেই আমাদের আমোদ ভঙ্গ হইবে, সুতরাং সেই অসহ্য জ্বালার নিরাকরণ জন্য উদ্যান-প্রবেশের পূর্ব্বেই আমি উহাকে দূর করিয়া দিব।" বিচক্ষণ আন্‌সারী এই অসৌজন্য-সূচক নিন্দনীয় প্রস্তাব শ্রবণে বলিলেন, "ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিও না, তাহা নিতান্ত নির্লজ্জ ও অসভ্য বর্ব্বরেরই শোভা পায়। জ্ঞানী ব্যক্তির ঈদৃশ আচরণ দূরপনেয় কলঙ্কের কথা—প্রকাশ হইলে লজ্জায় মুখ অবনত করিতে হইবে। আর সহসা এক ব্যক্তির অন্তরে কষ্ট দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি উহাকে নিতান্তই তাড়াইতে হয়, তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, সোজা পথ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে কৌশলে অথচ ভদ্রতা রক্ষার সহিত অভীষ্ট সফল হইবে। আইস, আমরা তিন জনে গভীর ভাবপূর্ণ এমন তিন চরণ কবিতা প্রস্তুত করিয়া রাখি, যাহার চতুর্থ চরণ কেহ যেন সহজে রচনা করিতে না পারে। আগন্তুক ব্যক্তি নিকটে

আসিলেই আমরা তাহাকে চতুর্থ চরণ পূরণ করিতে বলিব। যদি সে আমাদের কবিতার ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চতুর্থ পদ পূর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম হয়, তবে সে উদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইবে, আমরা তাহাকে সাদরে এবং অসঙ্কোচে গ্রহণ করিব; অন্যথা সে আগমন মাত্র স্বয়ং লজ্জিত হইয়া বিতাড়িত হইবে।”

কবি আন্‌সারী গর্ব্ব-স্ফীতবক্ষে ইহাই বলিয়া নীরব হইলেন। তখন অপর কবিদ্বয় সেই পরামর্শ সুযুক্তিসঙ্গত এবং কার্য্যসিদ্ধির সহজ উপায় বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার অনুমোদন করিলেন। অতঃপর কবিত্রয় কোন রমণীর সৌন্দর্য্যের উপর লক্ষ্য করত তৎক্ষণাৎ তিন চরণ শ্লোক রচনা করিলেন এবং এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, আগন্তুক সাধারণ ব্যক্তি; উহার বিদ্যাবুদ্ধিও অবশ্য তাদৃশী হইবে। সুতরাং এই কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। অপর এক জন কবি গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “আঃ কি বলিতেছ! বিদ্বান্ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী হইলেও কি উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ একটী গুরুতর বিষয় সমাধা করা সহজসাধ্য বিবেচনা কর? কাব্যকানন বিচরণ করা স্বল্প সাধনার কার্য্য নহে। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা যাঁহার প্রতি সদয়, যিনি পরম সৌভাগ্যবান্, তিনিই বিশ্ববিমোহন সুমধুর কবি নামে অভিহিত হইতে পারেন।” কবিত্রয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ফেরদৌসী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত

হইয়া শ্রমক্ষীণ স্বরে নম্রতার সহিত অভিবাদন করিলেন। তখন কবিত্রয় অভিবাদনের যথারীতি প্রত্যভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন, "মহাশয়! এটী রাজোদ্যান এবং আমরা রাজকবি। এস্থলে আমরা কবিত্ব-শক্তির উৎকর্ষ বিধানার্থ উপস্থিত পাদপূরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছি। সাধারণ জনগণের এখানে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। তবে যিনি আমাদের ন্যায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে উপস্থিত পাদপূরণে সফলকাম হইতে পারেন, তিনিই এই উদ্যান মধ্যে আমাদের সংসর্গে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন; অন্যথা তাঁহাকে ক্ষুণ্ণমনে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হয়। অতএব আপনি যদি এই প্রথানুযায়ী শ্রবণমাত্র আমাদের কথিত কবিতার চতুর্থ চরণ পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে উদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইবেন—আমরা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করিব; নতুবা এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান হইতে আপনাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।"

ফেরদৌসী এই কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন; তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্লতার উজ্জ্বলালোকে ভাসিয়া উঠিল। তিনি পথিমধ্যে যত কষ্ট পাইয়াছিলেন, এখানে আসিয়া তাহার অনেক পরিমাণে লাঘব হইল। তাই তিনি মৃদুহাস্যে নম্রভাবে কহিলেন, "মাননীয় রাজকবিত্রয়! ইহা তো অতি উত্তম কথা, নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি আপনাদের অবশ্যপালনীয় নিয়ম রক্ষা করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছি। যদি সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরম কারুণিক পরমে-

শ্বরের কৃপায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে আপনাদের ন্যায় পরমার্চ্চনীয় মহাত্মাগণের পরম সুখকর সংসর্গ লাভে আপ্যায়িত হইব, নতুবা নীরবে ও অবনত মস্তকে যদৃচ্ছা প্রস্থান করিব। আপনারা কবিতা আবৃত্তি করুন, আমি তাহার চতুর্থ পদ পূরণার্থে আমার ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োজন পূর্ব্বক অদ্য আমার ভাগ্য পরীক্ষা করি।"

আগন্তুকের এই উৎসাহপূর্ণ সদুত্তর শ্রবণান্তর প্রথমতঃ প্রবীণ কবি আন্‌সারী গম্ভীরভাবে কহিলেন—

"চুঁ আরজে তু মাহ্ নাবাশদ্ রৌশন,"
শশাঙ্ক সুন্দর নহে তব মুখ সম,

তৎপরে আস্‌জদী মৃদুহাস্যে কহিলেন—

"মানন্দ্ রোখ্‌ত্ গুল নাবুদ দর্ গুলশন্।"
বিমলিন তার কাছে পুষ্প মনোরম।

পরে ফর্‌রখী বলিলেন—

"মিজগানত্ গুজর্ হামে কুনদ্ দর্ জোশন্।"
ভ্রূ-পাঁতি তীরের ন্যায় মর্ম্মভেদ করে,

অমিত প্রতিভাশালী কাব্যকণ্ঠ ফেরদৌসী বক্তার বাক্যস্ফুরণ সাঙ্গ হইতে না হইতে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত অম্লানবদনে আবৃত্তি করিলেন—

"মানন্দ্ সিনানে গেও দর্ জঙ্গে পোশন।"
গেঁও বীর-অস্ত্র যথা পোশন-সমরে! (১)

কবিবর ফেরদৌসী শ্রবণমাত্র সেই কবিতার ভাষা ও মর্ম্মানুযায়ী চতুর্থ পদ রচনা করিয়া দিলেন। তখন মহাকবির অমানুষিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কবিত্বশক্তি দর্শনে রাজকবিত্রয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে প্রস্তর-প্রতিমাবৎ অচল ও নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন—তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, অন্তর দমিয়া গেল, দর্প চূর্ণ হইল। ভাবিয়াছিলেন,—অভ্যাগতকে আগমনমাত্র লজ্জিত হইয়া মলিনমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, তিনি তাঁহাদের নির্দ্দেশিত কণ্টকাকীর্ণ কাব্য-কাননের কমনীয় কুসুম চয়ন করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবেন না। কিন্তু ভস্মাবরণের মধ্যেও অগ্নি থাকে, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডেও বারিবর্ষণ করে, কদাকার কোষাভ্যন্তরেও রত্ন থাকিতে পারে, এবং অন্ধকারময় গভীর গহ্বরেই মণির উদ্ভব হয়, একথা তাঁহারা একবার ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ফলতঃ এক্ষণে তাঁহাদের পূর্ব্ব ধারণা তিরোহিত হইল, ভ্রম-ভঞ্জন হইল, দৃষ্টিপথের অর্গলবদ্ধ বিষম ব্যবধান সরিয়া গেল। বুঝিলেন, এই বৈদেশিক পুরুষ সামান্য ব্যক্তি নহেন—বুঝিলেন, সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতা ইহাঁকে অগাধ জ্ঞান, অপরিসীম পাণ্ডিত্য, এবং সর্ব্বো-

(১) পাঠকগণ পোশন সহ যুদ্ধে বীরবর গেঁওর অব্যর্থ শরসন্ধানের বিষয় শাহ্‌নামা পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

পরি অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন কবিত্রয় প্রতিশ্রুতি-পালনে বাধ্য হইয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যথোচিত সাদর সম্ভাষণের সহিত ফেরদৌসীকে গ্রহণ করিলেন এবং ততোধিক যত্নে আপনাদের বাসভবনে লইয়া গিয়া স্থান দান করিলেন।

ফেরদৌসী কবিত্রয়ের সৌজন্যে প্রীত হইয়া নিরুদ্বেগে রহিলেন। অতঃপর অনুদিন বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন প্রসঙ্গে তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা ও অদ্ভুত রচনাশক্তির অধিকতর পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। পরন্তু এই পরিচয় প্রকাশে মন্দভাগ্য ফেরদৌসীর আবার এক অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল,—অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উঠিল। ফেরদৌসীর গুণপনা দর্শনে যে কবিগণের অন্তর প্রথমতঃ প্রফুল্ল ও সদ্ভাবপূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শঠতা, কাপট্য, প্রতিহিংসা ও ঈর্ষায় পরিপূরিত হইয়া গেল! পরশ্রীকাতরতার দারুণ দাবানল তাঁহাদের হৃদয়ে সহস্র শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পাছে এই অপরিচিত পথিক সুলতান-সভায় প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, পাছে তাহার সহিত তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ না হন, পাছে তাঁহাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্ভ্রম নষ্ট ও গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, কবিগণের অন্তরে এইরূপ বিজাতীয় ভীতিমেঘ সঞ্চারিত হইয়া দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং এই আশঙ্কাক্রমেই তাঁহারা ফেরদৌসীকে মধুর মসৃণ বাক্যে তুষ্ট রাখিয়া কৌশলে রাজসভায় উপস্থিত করিতে বিরত রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুল্‌তান কর্ত্তৃক কবির আহ্বান ও শাহ্‌নামা রচনার আদেশ।

সরল-হৃদয় ফেরদৌসী কবিগণের সহবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বার্থান্ধ কবিত্রয় আপনাদের কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে বাহ্যতঃ বিবিধ প্রকারে যত্ন ও আদর দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু সংগোপনে ভীষণ কাপট্য-জাল বিস্তার করিয়া যাহাতে ফেরদৌসী ভগ্নোৎসাহিত হন, যাহাতে তিনি হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন, প্রতিদিন ছলে-কৌশলে তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। সরলচেতা ফেরদৌসী কবিত্রয়ের আদর-আপ্যায়নেই মুগ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের সে দুরভিসন্ধির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইলেন না; তিনি যে শত্রু-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, কবিত্রয়ের সংসর্গ তাঁহার পক্ষে যে মঙ্গলপ্রদ নহে, ইহা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। অথবা বুঝিলেই বা কি ফল-লাভ হইবে? আত্মীয়-স্বজন-পরিশূন্য এই দূরবর্ত্তী অনায়ত্ত স্থানে তিনি বুঝিলেই বা কি করিতে পারেন!! প্রভূত ক্ষমতা থাকিলেও তাহা এরূপ অবস্থায় কার্য্যসাধক নহে। কিন্তু ঐশী শক্তি ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সে শক্তির কার্য্য অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য। কোনরূপ প্রতিবন্ধক, কোনরূপ বিপরীত ভাব, সে শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইতেই পারে না। যাউক রবিশশী চির তমসাস্তূপ-গর্ভে, হউক নিমজ্জিত এই সুবিশাল পৃথিবী অগাধ জলধি-তলে, তথাপি শক্তিকেন্দ্র বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহা যদৃচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হইবেই হইবে। তিনি ন্যায়দর্শী ও প্রার্থনা-পূর্ণকারী। যে সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যে বিষয়ের চিন্তা করে, সেই সর্ব্ব-সিদ্ধি-দাতা পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহার তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ফেরদৌসীর মনোভিলাষ সফল হইবে না কেন? সেই স্বদেশহিতৈষী সুধীবরের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না কি জন্য? ফলতঃ কিছুদিন থাকিতেই ফেরদৌসীর মনে বিরক্তির সহিত চৈতন্যের উদ্রেক হইল। তিনি বুঝিলেন যে, তিনি এখানে কবিত্রয়ের সহিত কাব্যালাপ করিয়া আমোদোল্লাসে সময় যাপন করিতে আগমন করেন নাই; তাঁহার উদ্দেশ্য পৃথক। তখন তিনি সেই মহৎ উদ্দেশ্য, যাহার সফল কামনায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন করিবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর একদা মামক নামক গজনী-রাজসভার জনৈক লিপিকরের সহিত ফেরদৌসীর পরিচয় হইল। এই ব্যক্তি গুণগ্রাহী, উদারচেতা, দয়ালু ও অতীব ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফেরদৌসী তাঁহাকে স্বীয় গজনী-আগমনের তাবত বৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত করিলেন এবং বিনয়-নম্রবচনে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, একে একে স্বরচিত কবিতাবলী প্রদর্শন করিলেন। মামক কবির

অদ্ভুত কবিত্বশক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপার ভাবুকতা দর্শনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন। কিন্তু কয়েক দিবস পর্য্যন্ত তিনি সুলতান-সমক্ষে কবির সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিতে সুযোগ পাইলেন না। পরিশেষে ফেরদৌসী, রোস্তম ও সোহ্‌রাবের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত, যাহা ইতিপূর্ব্বে রাজকবি আন্‌সারি রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাই সযত্নে সুচারু শব্দবিন্যাস ও ললিত অলঙ্কার সংযোগে কাব্যাকারে গ্রন্থন পূর্ব্বক মামকের হস্তে প্রদান করিলেন। মামক এই কবিতা এবং কবির অপর কতিপয় উৎকৃষ্ট কবিতা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক স্বভবনে লইয়া গেলেন। অতঃপর একদা মহাকবির আগমনবার্ত্তা সুলতানের গোচরীভূত করিয়া সেই সমস্ত অমূল্য রত্ন স্বরূপ কবিতা প্রদর্শন করিলেন। বিদ্যালঙ্কৃত-হৃদয় গুণগ্রাহী সম্রাট মাহ্‌মুদ তৎসমুদয় পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া বিস্ময়াভিভূতচিত্তে রচনার লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং মনে মনে সমধিক প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া ফেরদৌসীকে রাজসভায় আনয়নার্থ মামকের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর মহামতি ফেরদৌসী মামক-মুখে অনুকূল সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দিত হইলেন এবং অদৃষ্টের পাষাণ-অর্গল ভেদ করিয়া এত দিনে দৈব প্রসন্ন হইলেন ভাবিয়া রাজাজ্ঞা পালন করিতে আর ক্ষণবিলম্ব করিলেন না। তিনি যথারীতি বিনয়-নম্রতার সহিত রাজভক্তি ও রাজসম্মান রক্ষা করিয়া

গজনীশ্বরের বীর-ধীর-জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক-মণ্ডলীপূর্ণ ভুবনবিখ্যাত রাজদরবারে উপনীত হইলেন এবং সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া সিংহাসন-সম্মুখভাগে নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। কাব্যামোদী সুলতান কবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রফুল্লবদনে তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও আদরাভ্যর্থনা করিলেন। তখন মহাকবি আপনার গুণপনা প্রদর্শনের সুযোগ বুঝিয়া অনতি-বিলম্বে স্বকীয় স্বাভাবিকী উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে বাদশাহের গুণগ্রাম ও রাজসভা এরূপ মনোরম শ্লোকমালায় গ্রথিত করিয়া বর্ণনা করিলেন যে, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক সভাস্থ পণ্ডিত ও পারিষদ-মণ্ডলী সংবলিত স্বয়ং বাদশাহ অতীব বিস্ময়ান্বিত ও মুগ্ধ হইলেন, ধন্য ধন্য রবে—কবির প্রশংসা-ধ্বনিতে সভামণ্ডপ শব্দায়মান হইয়া উঠিল। বিচক্ষণ সুলতান ফেরদৌসীর অনন্যসাধারণ অপার্থিব গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

যৎকালে কবিকুলকেশরী ফেরদৌসী গজনী নগরীতে আসিয়া সমুপস্থিত হন, সেই সময়ে রাজকবি আন্‌সারী শূরশ্রেষ্ঠ রোস্তম ও সোহ্‌রাবের অলৌকিক বীরত্বকাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য আন্‌সারীর যশোকীর্ত্তন ও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করাই তাৎকালিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাধারণ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ফেরদৌসী রাজসভাতেও তাহার যথেষ্ট

প্রমাণ পাইলেন। তখন চতুর কবি সার্ব্বজনিক রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বীরবর রোস্তম ও এস্‌ফন্দিয়ারের (১) ভীষণ সমর-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই তাহা হৃদয়-গ্রাহিণী সুমধুর ভাষায় সম্পাদন করিয়া উপহার স্বরূপ মহামনস্বী মাহ্‌মুদ শাহের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সুলতান প্রথমেই কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তদবলোকনে অধিকতর বিস্ময় সহকৃত আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ হর্ষ-বিস্ফারিত-লোচনে কবিকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক "যিনি অদ্ভুত ও অপার্থিব রচনা-শক্তি প্রভাবে মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুধা-ধারা প্রবাহিত করিতে সক্ষম, তিনি বাস্তবিকই স্বর্গীয়" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কবিবরকে "ফেরদৌসী" এই গৌরবাত্মক উপাধিভূষণে সমালঙ্কৃত করত যে কার্য্যে কবি আন্‌সারি ব্যাপৃত ছিলেন, সেই শাহ্‌নামা-রচনা-কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন।

সুল্‌তানের এই নিয়োগে সকলেরই সন্তোষ সাধিত হইল। সভাসদ্‌গণ সকলেই নবাগত কবির রচনা-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। অধিক কি, যাঁহার প্রশংসার উচ্চ নিনাদে এত দিন মহানগরী গজনী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, সাধারণ্যে যাঁহার আদরের সীমা ছিল না, যিনি রাজ-প্রদত্ত সম্মানের কনক-কীরিট শিরে ধারণ করিয়া এত দিন স্ফীতবক্ষে

(১) বীর-শার্দ্দূল রোস্তম, সোহ্‌রাব ও এস্‌ফন্দিয়ারের বৃত্তান্ত গ্রন্থকারের বঙ্গানুবাদিত শাহ্‌নামা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কাব্য-কাননে বিচরণ করিতেছিলেন, স্বয়ং সেই রাজকবি আন্‌সারী ফেরদৌসীর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা ও অদ্ভুত রচনা-নৈপুণ্যের প্রাধান্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার পূর্ব্বক বিনা বাক্যব্যয়ে কবিতা-কুসুম চয়নে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইলেন।

গজনীপতি ফেরদৌসীর কাব্য-শক্তিতে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আপনার পরম যত্নে রক্ষিত বিবিধ ফল-পুষ্পপূর্ণ মনোজ্ঞ উদ্যান মধ্যস্থ রমণীয় অট্টালিকায় তাঁহাকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সুশোভন উদ্যান-সৌধ যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র, ইরাণ ও তুরাণ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগত বাদশাহ, সভাসদ্ ও বিখ্যাত বীরবৃন্দের সুন্দর প্রতিকৃতি এবং হয়-হস্তী-ব্যাঘ্রাদির চিত্র দ্বারা সুশোভিত ছিল। ফেরদৌসীর পারিশ্রমিক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও যে তাদৃশ এক জন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মহিমামণ্ডিত দিগ্বিজয়ী নরপতির পদের সংপূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলতান প্রফুল্লবদনে, এক বা ততোধিক, অথবা যত দিনেই হউক, শাহ্‌নামার সহস্র শ্লোক রচিত হইলেই মহাকবিকে সেই প্রত্যেক সহস্র কবিতায় সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে প্রধান ধনাধ্যক্ষ খাজা আহ্‌মদ হোসেনকে অনুমতি করিলেন। ফেরদৌসী স্বকীয় আশানুরূপ এই রাজাজ্ঞা শ্রবণে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার নয়নে হর্ষাশ্রু ঝরিল,—অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি এত দিন পরে, আপনার মনোরথ সফল করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার উপায় হইল, ভাবিয়া মনে মনে জগন্নিধান বিশ্বকর্ত্তাকে অগণ্য

ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পরে বারংবার মুদ্রা গ্রহণ করা অসুবিধাজনক, ইহা অনুধাবন করিয়া রাজবাক্য শিরোধার্য্য করত মৃদুমধুর বিনয়বাক্যে কহিলেন, "নরনাথ! ভবদীয় এ আশ্রিত দীনের প্রতি যে অনুগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা উত্তম, সঙ্গত এবং সর্ব্বতোভাবে সুল্‌তানের গৌরবান্বিত নামের যোগ্য। কিন্তু একটী প্রার্থনা—প্রতি সহস্র শ্লোক রচনান্তে অর্থগ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত নহে। কেননা তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ অর্থগ্রহণ আমার পক্ষে অতীব অসুবিধাজনক এবং তাহা হস্তে আসিলে কিছু না কিছু ব্যয়িত হইয়া যাইবারও সম্ভব। সুতরাং তদ্দ্বারা আমার অভিলষিতরূপ ফল-লাভ করা ঘটিয়া উঠিবে না। সেই জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে, পুস্তক-রচনা পরিসমাপ্তির পর সমুদয় পারিশ্রমিক আমি একেবারে গ্রহণ করিব এবং তদ্দ্বারা মহামান্য বাদশাহের প্রসাদে দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জন্মভূমি তুস্ নগরের পয়ঃপ্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া আমার হৃদয়ের চিরসঙ্কল্পিত ব্রত কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ হইব। রাজন্! ইহাই আমার আশা, ইহাই আমার বাসনা। এক্ষণে বাদশাহের যাহা অভিরুচি, তাহাই স্থিরতর হউক।" সহৃদয় নরপতি মহাকবির সদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার এই যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনায় হাস্যমুখে সম্মতি প্রদান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাহ্‌নামা প্রণয়ন ও অঙ্গীকৃত অর্থ প্রাপ্তির ব্যাঘাত।

ফেরদৌসী কাব্যপ্রিয় সুলতানের প্রিয়পাত্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন। রাজাদেশে একটী মনোরম ভবন তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভবনটী সুসজ্জিত ;—নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও সুরঙ্গীন আলেখ্য ভিত্তি-গাত্রে প্রলম্বিত এবং অপর যে সমস্ত নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদয় যথাস্থলে সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে গেলে, অভাবের অস্তিত্ব সেই গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এহেন নির্ম্মল অনিল-হিল্লোলিত রমণীয় ভবনে সুকোমল আসনোপরি মহাকবি উপবিষ্ট—ধীর, শান্তমূর্ত্তি! একাগ্রচিত্তে তাঁহার পরমারাধ্যা কবিতা দেবীর সেবায় নিমগ্ন। প্রিয় পাঠক! ঐ দেখুন আত্মহারা ভাবুক কবির রত্ন-প্রসবিনী সুধাময়ী লেখনীর বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, অনর্গল লক্ষ্য স্থানাভিমুখে অনন্যমনে, অক্লান্ত অন্তরে প্রধাবিত হইতেছে। তিনি কেবল রচনা করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না, সুযোগানুসারে সময়ে সময়ে সুলতানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রচিত কবিতাবলী শ্রবণ করাইতেন, কখন বা সুলতানের গুণ-গৌরব বর্ণনাসূচক কবিতা পাঠ করত তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন। সুল্‌তান মাহ্‌মুদ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি বহু কবির বহু কবিতা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু ফেরদৌসীর কবিতায় যেরূপ ভাবুকতা, যেরূপ মাধুর্য্য,

যেরূপ প্রাঞ্জলতা ও যেরূপ মোহময়ী আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা অন্য কাহার কবিতায় নাই। ইহা যত শ্রবণ করা যায়, শ্রবণেচ্ছা ততই বলবতী হইয়া উঠে এবং হৃদয়ের স্তরে স্তরে কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা শ্লথ হৃদয়ের সজীবতা, সন্তপ্ত প্রাণে প্রফুল্লতা এবং অবসন্ন চিত্তে স্বচ্ছন্দতা প্রদান করে।” আহা এ জগতে কবির এবং তদীয় কবিতার প্রকৃত পুরস্কার ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে লাগিল, ফেরদৌসীও ক্রমশঃ গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, বিনীত বাক্যালাপে ও মধুর শিষ্টতায় রাজসভাসদ হইতে সাধারণ জনগণের কেহই তাঁহার বশীভূত হইতে বাকি রহিল না। তিনি বৃদ্ধের স্নেহ, যুবকের সম্মান, সমবয়স্কের বন্ধুত্ব ও বালক-হৃদয়ের সরল প্রেম প্রাপ্ত হইলেন; সকলেরই সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল, সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎ স্বার্থ-জড়িত! কবি বলিয়াছেন—

স্বার্থের শৃঙ্খলে বাঁধা অখিল সংসার!
স্বার্থ বিনা কেবা কোথা কার্য্য করে কার?

কথাটী অভ্রান্তরূপে সত্য। উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সকলেরই অন্তরে সতত স্বার্থ জাগরূক; স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং এস্থলেও সেই চিরাগত প্রথার ব্যতিক্রম হইবে কি জন্য?

ফেরদৌসী সময়ে সময়ে মহামতি সুলতানের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ যে প্রভূত অর্থাদি প্রাপ্ত হইতেন; দরবারস্থ অর্থলোলুপ সভাসদগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুযায়ী তাহার অংশ গ্রহণ করিতেন। কারণ তাঁহারা ফেরদৌসীর পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। কিন্তু ফেরদৌসী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না, তবে তাঁহাদের অবৈধ আচরণ ও নীচতা দর্শনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইতেন। ফলতঃ তিনি ইচ্ছা করিলে সেই অর্থরাশির এক কপর্দ্দকও কাহাকেও না দিয়া স্বয়ং রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার দৃক্‌পাত ছিল না। গ্রন্থ রচনান্তে বিপুল ধনপ্রাপ্তি হইবে, ইহাই তৎকালে তাঁহার লক্ষ্যের একমাত্র বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। * এই সুদীর্ঘ সময় অমরাবতী সদৃশী মহানগরী গজনী রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া, মহাত্মা ফেরদৌসী অক্লান্ত হৃদয়ে অগাধ পরিশ্রমে এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ও অপার যত্নে ষষ্টি সহস্র শ্লোকপূর্ণ ভুবনবিখ্যাত ঐতিহাসিক মহাকাব্য শাহ্‌নামা রচনা করিলেন। এত দিনে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল, এত দিনের পরে কবির কঠোর পরিশ্রমের অবসান হইল,—তিনি তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ বিশাল চিন্তাবারিধির অপার জলরাশি অতিক্রম করিয়া তীর-ভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এ পর্য্যন্ত যে সাধন-

* এই সময়ের মধ্যে মহাকবি কয়েকবার সুলতানের অনুমতি লইয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

সহিষ্ণু মহাপুরুষ মুহূর্ত্ত কালও বৃথা অতিবাহিত করেন নাই, যামিনীর অধিকাংশ সময় জাগিয়াও যিনি স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রের সীমা দেখিতে পান নাই, এক্ষণে মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে তিনি নিশ্চিন্ত মনে শান্তিসুখে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইলেন।

এই ত্রিংশ বর্ষকাল ফেরদৌসী-জীবনের স্বর্ণ-যুগ বলিতে হইবে, অথবা ইহা তাঁহার জীবনের কর্ম্মযুগ বলিলেও বলা যাইতে পারে। রাজসুখ-ভোগ, প্রতিষ্ঠা-লাভ, প্রতিপত্তি প্রাপ্তি, ধনোপার্জ্জন, সর্ব্বোপরি তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনা, এই সময়ের মধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সময়ে শত শত লোক তাঁহার দর্শনার্থী, শত শত লোক তাঁহার স্তুতিগানকারী, শত শত লোক তাঁহার অনুপম কাব্যামৃত-পান-প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুর ত সংখ্যাই ছিল না। আবার যে শত্রুও ছিল না, এমত নহে। কেননা পরশ্রীকাতর স্বার্থান্ধ খল, নীচমনা দুষ্টাশয় ক্রূর পরোন্নতি দর্শনে কখনই সুখানুভব করে না, তাহার যেন মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়, তাহার মনে হিংসাবৃত্তি কাল বিষধরের ন্যায় স্বতই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সে সেই অসৎ প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া পরকীয় অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে কেহ স্বার্থের ব্যাঘাতে, কেহ কবিমুখে আপনার প্রশংসা-গাথা না শুনিয়া, কেহ বা তাঁহার কবিতার ভাবানুসারে তাঁহাকে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক অবধারণে, তাঁহার উপর বিরক্ত ও তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ তাহাতেও

তাঁহার কোন ভাবনার কারণ ছিল না। যেহেতু সেই ক্ষুদ্রশক্তি রিপুকুল রাজশক্তির সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার একটী প্রবল বৈরী তদীয় কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল। সেই বৈরী গজনীরাজের উজির হোসেন ময়মন্দী। অমাত্য-প্রধান হোসেন ময়মন্দী একে পরশ্রীকাতর ও কপট প্রকৃতির লোক ছিলেন, তদুপরি আবার তাঁহার সম্বন্ধে কোনও স্তুতিগাথা রচনা না করায় ফেরদৌসী তাঁহার বিদ্বেষ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি দারুণ অভিমান বশতঃ ফেরদৌসীর সহিত বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। তেজস্বী ফেরদৌসীও তোষামোদকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে একটী প্রবল শত্রু জানিলেও ভ্রমেও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেন না, অথবা হইলেও "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। এই চতুরতাময় ব্যবহারে মন্ত্রীর মনে বিজাতীয় বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। হায়! সময়ে যে ইহা কি ভীষণ হলাহলময় ফল প্রসব করিবে, কি ঘোর সর্ব্বনাশের প্রসূতি স্বরূপ হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ-অন্ধীভূত ফেরদৌসী একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি রাজপ্রাসাদে থাকিয়া শুভাশুভ ভাগ্যলিপির নিয়ন্তা অদ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করত প্রশান্তচিত্তে স্বীয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে বিদ্বজ্জনশরণ অমিতপ্রতাপ সম্রাট মাহ্‌মুদ

শাহের সমীপে শাহ্‌নামা পরম যত্নে উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইল। সুল্‌তান শাহ্‌নামার নাম শ্রবণে সমধিক ব্যগ্রতা ও উৎসাহ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া গ্রন্থের লালিত্যে বিমুগ্ধ ও গভীর ভাব-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া অনুপম স্বর্গ-সুখাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক মুক্ত-কণ্ঠে অমর কবির ভূয়সী যশোব্যাখ্যা করিলেন। তিনি একে একে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে সেই রত্নখনি সম মহামূল্য মহাকাব্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে স্থানে পাঠ করিলেন, তিনি সেই খানেই মুগ্ধ হইয়া কেহ "ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুধাধারা ক্ষরিতেছে," কেহ "কাব্যের সর্ব্বাঙ্গে মুক্তামালা গ্রথিত হইয়াছে," ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একবাক্যে রচয়িতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই আনন্দ-কোলাহলে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর বিচক্ষণ গজনীপতি অমাত্য-শ্রেষ্ঠ হোসেন ময়মন্দীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "জগৎ গুণের পক্ষপাতী। গুণবানের সম্মান রক্ষা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যিনি গুণীর গুণের আদর করিতে জানেন না, তিনি মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। তিনি পণ্ডিত হইলেও মূর্খ; ধনী হইলেও নির্ধন এবং প্রবীণ হইলেও অর্ব্বাচীন বালক, ইহা জগৎ বলিতে বাধ্য। অতএব মন্ত্রিন! আমার অঙ্গীকৃত দিনার (সুবর্ণ মুদ্রা),—যাহা কাব্যের শ্লোক-সংখ্যানুসারে গণনায় ষষ্টি সহস্র নির্ণীত হইতেছে, (১) তাহা এবং তৎসহ

(১) ৬০ সহস্র দিনার বর্ত্তমানের প্রায় ৭॥০ লক্ষ টাকার সমান

পুরস্কার স্বরূপ হস্তীখেলাতাদি মহাকবি ফেরদৌসীর নিকটে প্রেরণের বন্দোবস্ত কর।”

সুলতানের এই আদেশ শ্রবণে হোসেন ময়মন্দীর অন্তরে যে বিদ্বেষ-বহ্নি পূর্ব্বাহ্ণে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে দপ্ দপ্ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পরম শত্রু ফেরদৌসীর সৌভাগ্যসঞ্চার দর্শনে মর্ম্মবেদনায় কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং কিসে তাঁহার অনিষ্ট হইবে, কি করিলে তাঁহার আশা-তরু উন্মূলিত হইতে পারে, চিন্তাকুল চিত্তে সেই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে মন্দ বুদ্ধি শীঘ্রই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে! পক্ষান্তরে সৎকার্য্যের সূত্র শত যত্নেও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। পরের অনিষ্ট অনায়াসেই করা যাইতে পারে, কিন্তু উপকার করা সহজ নহে। এই যে কারুকার্য্য-বিচিত্রিত সুন্দর অট্টালিকা নভস্পথে মস্তকোন্নত করিয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে, ইহা এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভূমিসাৎ করা যাইতে পারে, কিন্তু গঠন করিতে কত যত্ন, কত শ্রম, কত সময় লাগিয়াছে, একবার তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি? যদি বুঝিতে, জগৎ যদি তাহা বুঝিত, তবে পরহিংসা, পরদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্য-সমাজে কখনই প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না—সংসার সুখের শান্তি-নিকেতন হইত। কিন্তু মর জগতের বুঝিবার সে শক্তি কোথায়? জগৎ সেরূপ সুখময় স্বর্গরাজ্য হইবে কেমন করিয়া? সর্ব্ব বিঘ্ন-সঞ্চারিণী মোহময়ী মায়া স্বীয় অক্ষুণ্ণ প্রতাপ

বিস্তার করিয়া মানবকে ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় অসৎ কার্য্যের দিকে যে প্রতিনিয়তই পরিচালিত করিতেছে! দুর্ব্বল মানব তাহাতেই মগ্ন! তাহাতেই ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় সতত ভাসমান! মায়ার সে প্রভাব, সে প্ররোচনা পরিহার করিতে পারে, এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে এরূপ ক্ষমবান বীরপুরুষ অতি বিরল। গজনীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী হোসেন ময়মন্দীও আজ সেই কুহকিনী মায়ার সর্ব্বতোমুখী প্রবল প্রভাবের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন—তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন; তাই তিনি অতি সহজেই অনিষ্টকারিতার কৌশলময় উপায় উদ্ভাবন করত গজনীশ্বর সুলতান মাহ্‌মুদকে বিনয় ও নম্রতার সহিত কহিলেন, "সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি, অনধিকার চর্চ্চা হইলে অনুগৃহীত দাসের সে অপরাধ কৃপাবলোকনে মার্জ্জনা করিবেন। সুলতান অবশ্যই অবগত আছেন যে, ফেরদৌসী এক জন হীনাবস্থাপন্ন অতি সামান্য ব্যক্তি,—স্বর্ণ-মুদ্রা কখন চক্ষে দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এমত স্থলে যদি এই অঙ্গীকৃত প্রচুর অর্থ ও বাদসাহ-প্রদত্ত মূল্যবান পরিচ্ছদাদি পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এককালে প্রদান করা হয়, তবে তাঁহার ইহ জীবনে তৎসমুদয় ভোগ করা দূরে থাকুক, বরং তিনি দর্শনমাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া অকালে শমন-পথের পথিক হইবেন। কেননা সুখাবসানে সহসা অতি দুঃখ, অথবা দুঃখাবসানে অতি সুখ উপস্থিত হইলে মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ইহা জগৎবাসী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। সেই জন্যই

বলিতেছি, অঙ্গীকার পালন করিতে গিয়া এক জনের মৃত্যুর কারণ হইয়া চিরদিনের জন্য দুরপনেয় দুর্ণাম ও মনস্তাপ ক্রয় করা কোনক্রমেই উচিত নহে। এক্ষণে জাঁহাপানার যাহা অভিরুচি, তাহাই সম্পাদিত হউক, আমার কর্ত্তব্য চরণোপান্তে নিবেদন করিলাম মাত্র।”

প্রধান মন্ত্রী হোসেন ময়মন্দী অতি বিচক্ষণ, সদ্বক্তা ও বাদশাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বাভাবিকী মধুর বক্তৃতা-শক্তি দ্বারা এই বিষয় এরূপ উদ্দীপনার সহিত অথচ প্রকাশ্যে সরলতা রক্ষা করিয়া ব্যক্ত করিলেন যে, বাদশাহ নীরবে তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রত্যেক বাক্য সমীচীন ও অবশ্য গ্রহীতব্য বলিয়া অবধারণ করিয়া লইলেন। হায় যে ভীম-বিক্রান্ত অদ্বিতীয় বীরপুরুষ স্বীয় অমিত শৌর্য্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে কত রাজ্য ও রাজধানী বিধ্বস্ত, করতলগত এবং সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, যিনি কত মদমত্ত রাজা, উদ্ধত রাজপুত্র বা অন্যবিধ ব্যক্তির ভাগ্য-চক্রের গতি দিগন্তরে বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছেন; আজ সেই তীক্ষ্ণধী সুলতান মাহ্‌মুদ মন্ত্রীর এই কৌশল-জাল ছিন্ন করিতে পরাভব মানিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তাকুলচিত্তে আপন প্রতি-শ্রুতি ও মন্ত্রীর মন্ত্রণা, এই উভয় বিষয় আলোচনা করিয়া মনে মনে বহু বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে অনেক বিবেচনার পর মন্ত্রীর বাক্য সুযুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ জ্ঞান করিয়া কহিলেন, “আমি ত কবিবরের দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা

কামনা করি। কেননা আজ কাল এরূপ অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন কবি অপর একটী দেখিতে পাওয়া কঠিন।” ইহা বলিয়া তিনি ফেরদৌসীর নিকট স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ষষ্টি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পাঠাইতে অনুমতি করিলেন। তখন মন্ত্রীর পরিশ্রম সফল, বৈরিতাসাধন-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত ও মনস্কামনা পূর্ণ হইল, তাঁহার অন্তর হইতে কি যেন এক গুরু ভার অপসারিত হইয়া গেল।

এস্থলে আমরা সত্যের অনুরোধে সহৃদয় পাঠকবর্গের সমক্ষে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে প্রধান মন্ত্রী হোসেন ময়মন্দীর চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিতে গেলে উক্ত বর্ণনা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না,—উহাতে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কেননা যে ব্যক্তি ভুবনবিজয়ী মহাজ্ঞানী সুলতান মাহ্‌মুদের মন্ত্রীকুল-শিরোমণি ছিলেন, যাঁহার সুমন্ত্রণা প্রভাবে একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইত, যিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও সহৃদয় বলিয়া সর্ব্ব সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সেই উন্নতচেতা হোসেন ময়মন্দীর চরিত্রগত দোষ যে এতদূর নীচতাব্যঞ্জক, ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় ছিল, তিনি যে ঈদৃশ সঙ্কীর্ণ-চেতা ছিলেন, তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না;—মন যেন সে কথায় সম্মতি দিতে চাহে না। বিশেষতঃ গ্রন্থান্তর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কবির সহিত মন্ত্রী ময়মন্দীর কস্মিনকালে কোনও প্রকার অসদ্ভাব ঘটে নাই,

তিনি ফেরদৌসীর এই মহদনিষ্টের অনুষ্ঠাতা বা অধিনায়ক ছিলেন না। এ বিষয়ে যে তিনি নির্লিপ্ত ও নির্দ্দোষ ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। পরন্তু ইহাতে যে তাঁহার কিঞ্চিৎ ত্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অবলীলাক্রমে স্বীকার করিতে বাধ্য। কেননা এতাদৃশ একটী গুরুতর কার্য্যের অবতারণা একেবারেই কিছু মন্ত্রীর অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় নাই। মহাকবির সেই গ্রহবৈগুণ্যের নায়ক যে অপর কোন এক ব্যক্তি ছিল, তাহা তিনি অবশ্যই অবগত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাহা জানিতে পারিয়াও প্রতীকার চেষ্টা করেন নাই। যদি তিনি তাহা করিতেন, যদি ফেরদৌসীর পক্ষ সমর্থনার্থ একটী কথাও কহিতেন, তবে আজ আমরা কবি-ভাগ্যের বিষম বিড়ম্বনা ও বাদশাহের অপযশঃ-কাহিনী শুনিতে পাইতাম না, তবে আজ মহাকাব্য শাহ্‌নামা-শিরে সম্রাট-শ্রেষ্ঠ মাহমুদের ভীষণ অপবাদ-গাথা গ্রথিত দেখিতে পাইতাম না। সুতরাং ইহা যে তাঁহার একটী অমার্জ্জনীয় ত্রুটি বা ভয়ানক ভ্রম, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? যাহা হউক, উল্লিখিত গ্রন্থে কবির সেই বিরুদ্ধবাদীর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা প্রকটিত করা হইল।

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কবিবর ফেরদৌসী গজনী নগরীতে জীবনের এই নূতন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরিণাম-দর্শিতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি

রাজাজ্ঞানুসারে যে সভাসদের নিকট হইতে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইভেন, সেই ব্যক্তির মানসরঞ্জন ও সম্মান প্রদর্শনার্থ তৎসম্বন্ধে কতিপয় প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন। কিন্তু আয়াজ নামক এক ব্যক্তি বাদশাহের প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন; আয়াজ ফেরদৌসীর অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। ভ্রান্ত ফেরদৌসী সেই আয়াজের বিষয় কিছুই করেন নাই। এই নিমিত্ত আয়াজ অতিশয় কোপান্বিত হন এবং মানবস্বভাবসুলভ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ফেরদৌসীর অনিষ্ট ও তাঁহার রাজকীয় স্বার্থ ব্যর্থ কামনায় গোপনে ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকেন। সহজে সুযোগও ঘটিয়া গেল। তিনি ফেরদৌসীর রচিত কবিতা হইতে এমত কতিপয় শ্লোক নির্ব্বাচন করিয়া বাহির করিলেন, যাহা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ও সত্য বিশ্বাসের অন্তরায় বলিয়া ব্যাখ্যা করত সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। আয়াজের সেই ব্যাখ্যা পরম্পরায় ফেরদৌসী প্রকৃত ধর্ম্মমতবিরোধী শিয়া-মতাবলম্বী অথবা কল্পনার উপাসক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন হইলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ এক জন স্বধর্ম্মপরায়ণ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পবিত্র কোরাণ-বহির্ভূত কার্য্য অতি অপকর্ম্ম ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে, ফেরদৌসী এক অতি ঘৃণিত ও অপবিত্র মতের পোষক, তখন তাঁহার অন্তর ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠিল, চক্ষু রক্তরঞ্জিত হইল। কবির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় প্রীতি, ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, তাহা

দূরীভূত হইয়া গেল। তৎস্থলে অভক্তি, অসূয়া ও বিজাতীয় ঘৃণা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

মহাকবি ফেরদৌসী সভাসদজনের ঈর্ষার কথা ও অপর কোন কোন ব্যক্তির মনোভাব ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সুলতানের বিষম বিরক্তির কথা জানিতে পারিয়া তিনি অতীব উদ্বিগ্ন ও আপনাকে মহাবিপদাপন্ন জ্ঞানে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন? কিরূপে বাদশাহের ক্রোধের শান্তি করিবেন? কিরূপে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবেন? কি কৌশলেই বা জীবন রক্ষা হইবে? এই দুর্ভাবনায় তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইল। সুতরাং তখন কোনই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া সুযোগানুসারে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আপনার ধ্বংসকারী মিথ্যাপবাদ ক্ষালনার্থ বাদশাহের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া করুণকাতরে অথচ দৃঢ়তার সহিত তদ্বিষয় অস্বীকার পূর্ব্বক যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিলেন। আয়াজ যে সমস্ত কবিতার ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের পার্থক্য ও দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তীক্ষ্ণধী ফেরদৌসী তৎসমুদয় আপন অনুকূল মতের পরিপোষক এবং সত্য বিশ্বাসের বিপরীত নহে, ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সুলতানের গোচর করিলেন। মাহ্‌মুদ তাহাতে সংপূর্ণ সন্তুষ্ট না হইলেও কবিকে অভয় দান করিলেন এবং অন্যমনস্ক-ভাবে এই মাত্র বলিলেন যে, "তুস্ নগরনিবাসী যাবতীয়

লোক এই একই চরিত্রবিশিষ্ট; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পর সমান।”

যাহা হউক, কবি রক্ষা পাইলেন। সুলতান তাঁহাকে অভয়দান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ তিরোহিত হইল না। অমঙ্গলের ভীষণ বিভীষিকা যেন প্রতিমুহূর্ত্তে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন? উপায় নাই। রাজার অসন্তুষ্টিতে বিষম বিপন্ন হইয়াও তিনি অপার্য্যমানে ও স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধার জন্য অরাতি-বেষ্টিত হইয়া গজনীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেইরূপ ভয়ানক আশঙ্কা এবং দুশ্চিন্তার গভীর গহ্বরে নিপতিত হইয়াও তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম লাভ করে নাই। হৃদয়ে চিন্তা, মনে ভয়, নয়ন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় চতুর্দ্দিকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিরত; আর লেখনী অবিরাম গতিতে পরিচালিত! কিন্তু সুখের বিষয়, এই উৎকণ্ঠা-অশান্তির মধ্যেও তিনি আশার সূত্রবৎ সূক্ষ্ম রেখা দেখিতে পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। বিধাতার কৃপায় এই সময়ে সাধারণ জনগণ কবির কাব্য-ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি সমধিক ভক্তিমান হইয়াছিলেন। সেই ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ প্রতিদিন চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ উপাদেয় উপহার আসিয়া তাঁহার ভবন পূর্ণ হইতে লাগিল। কে পাঠাইল? এবং কেন পাঠাইল? তাহা তিনি জানিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেন না; কিন্তু

তদ্দ্বারা সাধারণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং সেই আনন্দ ও উৎসাহ-বলে বলীয়ান হইয়াই কবি ধীরতার সহিত শান্তচিত্তে শাহ্‌নামা-রচনা. পরিসমাপ্তি করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাকবি ফেরদৌসীর ত্রিংশৎ বর্ষব্যাপী অবিরাম পরিশ্রমের ফল শাহ্‌নামা যথাসময়ে গজনীশ্বরের দরবারে প্রেরিত হইলে, গুণগ্রাহী সুলতান মাহ্‌মুদ সেই কাব্যজগতের নভস্পর্শী সমুজ্জ্বল স্তম্ভ স্বরূপ মহাকাব্য দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহারই সাহায্যে ঈদৃশ একটী চিরস্মরণীয় মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, এই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া স্ফীতবক্ষে আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে কবিকুলশ্রেষ্ঠ ফেরদৌসীকে প্রতিশ্রুত মুদ্রা দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ক্রূরমতি রাজসহচর আয়াজের এ পর্য্যন্ত ক্রোধশান্তি হয় নাই। তাঁহার প্রথম কৌশল নিস্ফল হওয়ায় তিনি অধিকতর কুপিত ও উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি সময়ে ফেরদৌসীর অপকার্য্যের প্রতিশোধ নিশ্চিতই লইবেন। এক্ষণে সেই শত্রুতা সাধনের—প্রতিহিংসা চরিতার্থতার শুভ সুযোগ উপস্থিত; সুতরাং আয়াজ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? শিকার সম্মুখীন হইলে শিকারী কখনই অন্যমনস্ক থাকে না, কিন্তু আপন আয়ুধগুলি গুছাইয়া লইয়া নিক্ষেপের উপায় দেখে। ধূর্ত্ত আয়াজ তাই আজ শত্রুহননার্থ প্রস্তুত হইয়া রাজ-সকাশে উপনীত হইলেন এবং বিবিধ প্রকারে

মৃদু মধুর বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া স্বলতানের মনের গতি ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা ফলবতী হইল, স্বলতান জাল-জড়িত হইলেন, তাঁহার দূরদর্শিতা তিরোহিত হইল। তিনি আপনার অঙ্গীকার এবং ফেরদৌসীর কার্য্যের গুরুত্ব ও পরিশ্রমের গভীরতা আর তলাইয়া বুঝিলেন না, কি যেন এক মোহ-বশে প্রিয়তম পারিষদ আয়াজের কথা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আয়াজের আনন্দের অবধি রহিল না, তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে—বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। দেখিলেন, প্রিয় পাঠক! রাজ-সকাশে আয়াজের প্রভাব কত! প্রতিপত্তি কীদৃশ!! অহো সেই অনিবার্য্য প্রভাব ও অসীম প্রতি-পত্তি বশতই আয়াজ আজ স্মিতমুখে কবির অনিষ্টসাধনে উৎ-সাহিত। ঐ দেখুন, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বলতানের জ্ঞাতসারে স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ষষ্টি সহস্র দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ফেরদৌসী সমীপে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। ফেরদৌসী ন্যায়ানুগত অধিকারে বঞ্চিত হইলেন। হায় এ জগতে কবি-ভাগ্যের চিরদিনই এইরূপ বিড়ম্বনা!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুলতানের ক্রোধ ও ফেরদৌসীর পলায়ন।

আয়াজের মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। আজ তাঁহার আহ্লাদের সীমা নাই; তিনি মনে মনে আত্মক্ষমতার প্রশংসা করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছেন এবং সমচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্পর্দ্ধার সহিত আস্ফালন করিতেছেন। কিন্তু তখনও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, যাহা কেবল বাক্যে হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কখন্ রজনী প্রভাত হইবে, কখন্ ফেরদৌসীর ত্রিংশ বর্ষের শ্রম-জল-বর্দ্ধিত আশা-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত এবং তৎসহ স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই দুর্ভাবনায় আয়াজের নেত্রদ্বয়ে আর নিদ্রা আসিল না; দীর্ঘ সময় জাগরিত অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে নিশীথকালে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিলেন, কিন্তু স্থির নহেন। কখন ছাদোপরি সুশীতল মারুতহিল্লোলে উপবেশন করিতেছেন, কখনও বা ইতস্ততঃ মৃদুমন্দ পদচারণা করিয়া ফিরিতেছেন, আর দুর্ম্মনায়মানভাবে প্রকৃতির প্রমোদকর বিচিত্র শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেখিতেছেন, অপার আকাশ-বারিধি-বক্ষে অশান্ত নীরদ-লহরীমালা ওতপ্রোতভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, কোনটী বা দলভ্রষ্ট হইয়া বেগে ছুটিয়া গিয়া অলক্ষ্যে কোথায়

মিশিয়া যাইতেছে। রুচির নক্ষত্রনিকর সেই উচ্ছৃঙ্খল মেঘমালার অত্যাচারে কখন নিমজ্জিত, কখন ভাসমান হইতেছে। তাহাদের কনক-কান্তির কমনীয় প্রভা অপূর্ব্ব মাধুরী ঢালিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই সমস্ত নয়নাভিরাম দৃশ্য আয়াজের অন্তরে কিছুমাত্র অঙ্কিত হইতেছে না। আয়াজ যে মহাধ্যানে মগ্ন, যে গভীর চিন্তায় নিরত, অনন্যভাবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন; তাঁহার সে ধ্যানমুগ্ধ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় বাহ্য দৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছে না—আপন লক্ষ্য বস্তুর অপেক্ষাতেই মজিয়া রহিয়াছে। এ দিকে পূর্ব্বনভঃ ক্রমেই পরিষ্কৃত; আলোকের অস্ফুট ছটা শনৈঃ পাদ-বিক্ষেপে জগতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নলিনীনায়ক দিনকর উদয়গিরি অতিক্রম করিয়া নেত্র-পথে সমুপস্থিত। কি রমণীয় দৃশ্য! কি চিত্ত-চমৎকারী চিত্র!! পৃথিবী যেন নব নয়ন-রঞ্জন সাজে সজ্জিত হইয়া আনন্দে হাসিতে লাগিল। সেই হাসি কত দূরদূরান্তের তরুলতা, নদনদী, অরণ্য-পর্ব্বত পার হইয়া গিয়া অবশেষে আয়াজের বদনে পড়িল, তাহাতে আয়াজের সমাধি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আয়াজ সেই হাসিরাশির সহিত আপন হাসি মিশাইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

আয়াজ সর্ব্বাগ্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সাধন করিয়া রাখিয়া কোষাগারে গমন করিলেন এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট ষষ্টি সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক থলিয়া-বন্ধ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত থলিয়া হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক জনৈক

রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ফেরদৌসীর বাসভবনে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে ফেরদৌসী সাধারণ-স্নানাগারে স্নান করিতেছিলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সুলতান-প্রেরিত মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া-পৃষ্ঠে হস্তী সহ রাজানুচর তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। এই সুসমাচার শ্রবণে ফেরদৌসী আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন; হর্ষে তাঁহার আপাদ মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া গেল; তাঁহার অন্তরে কি যে এক অপূর্ব্ব সুখের তুফান বহিতে লাগিল, তাহা লেখনী-সাহায্যে প্রকাশ করে কাহার সাধ্য! আশা পূর্ণ হইল—পরিশ্রম সার্থক হইল ভাবিয়া, তিনি তখনই মঙ্গলময় বিশ্বপতিকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও মাহ্‌মুদ শাহের অশেষ কল্যাণ কামনা করিলেন এবং সত্বর স্নানকার্য্য সমাপনান্তে সহর্ষে স্নানাগার হইতে বহির্গত হইলেন। অমনি সুলতান্‌-প্রেরিত মুদ্রাথলি সমূহ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তিনি হর্ষবিস্ফারিত লোচনে অগ্রসর হইয়া মাহ্‌মুদ শাহের জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক তৎ-সমুদয় গ্রহণ করিলেন। তখন কি এক ভাববশে তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ স্ফূর্ত্তিতে স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু হায় হরিষে বিষাদ! আশায় প্রতারণা!! সকলই নিরর্থক—সকলই আকাশকুসুমবৎ নিস্ফল হইল। দরিদ্র ফেরদৌসী সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিয়াছিলেন, গজনীপতি অবশ্যই অঙ্গীকৃত সুবর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু সে অটল বিশ্বাস—সে আশা-ভরসা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া গেল,—থলিয়া সমূহের মুখবন্ধন উন্মোচন করিতেই তন্মধ্যে রৌপ্য-মুদ্রা দর্শনমাত্র

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভীষণ কালানল সহযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন;—হৃদয় দমিয়া গেল, বদন বিকৃতভাবে দিগন্তরে ফিরাইয়া লইলেন এবং মাহ্‌মুদ শাহের অকথ্য অন্যায়াচরণে মহাক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইলেন। ফলতঃ এই প্রবঞ্চনাময় অবজ্ঞাজনক কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসহ্য অবমাননা বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি ক্ষোভের সহিত এতদূর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, পূর্ব্বাপর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই ঐ মুদ্রারাশি তুচ্ছজ্ঞান করত সর্ব্ব জন সমক্ষে উহার বিংশতি সহস্র স্নানাগারের রক্ষককে এবং বিংশতি সহস্র জনৈক মিষ্টান্ন-বিক্রেতাকে দান করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট যে বিংশতি সহস্র রহিল, তাহা রাজকীয় মুদ্রা-তত্ত্বাবধায়ক ভৃত্যকে প্রদান করিয়া দুঃখকম্পিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “সুলতানকে জ্ঞাপন করিও যে, ফেরদৌসী এই রৌপ্য-রাশি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ত্রিংশ-বর্ষব্যাপী অসহনীয় পরিশ্রমের দ্বারা স্বীয় শরীর-শোণিত জল করে নাই।”

তেজস্বী ফেরদৌসীর এই অর্থ-বিতরণের সংবাদ অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সকল সমাজেই আন্দোলন চলিতে লাগিল। তরলমতি লোকেরা কার্য্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কহিল “ফেরদৌসীর কি হৃদয়-বল! একেবারে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বিতরণ করা সহজ কথা নহে! ফলতঃ যাহারা তাহা পাইয়াছে, তাহারাই ভাগ্যবান্” বলিয়া কতই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; কাহারও বা আক্ষেপে

মর্ম্মচ্ছেদ হইল। কোন জ্ঞানী মহোদয় কবির অবিমৃষ্য-কারিতা, অসৌজন্য ও অভদ্রতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতার উৎস খুলিয়া দিলেন। কোন ব্যক্তি বা রাজ্যাধিপতির প্রতিজ্ঞা-পালনাক্ষমতার উল্লেখে অতি সন্তর্পণে ও মৃদুস্বরে স্বদলের মধ্যে সাহসের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইল না। নগরময় এই একই কথা—বাল-বৃদ্ধ-মহিলা-সমাজে এই কথারই রটনা। সুলতান মাহ্‌মুদও যথাসময়ে এ ঘটনা কর্ণগোচর করিলেন; শ্রবণমাত্র তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, কার্য্যটা অতি অন্যায় ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত হইয়াছে; কবির প্রতি তিনি প্রকৃতই অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। অনুতাপে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল, তৎসহ ক্রোধেরও উদ্রেক হইল। তিনি যে প্রিয় পারিষদের প্ররোচনায় এই অমোচনীয় কলঙ্কের কার্য্য করিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই আয়াজের উপর অতীব অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না; কেবল রোষ-কষায়িত লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত আয়াজ বাদশাহের সেই বাহ্য ভাব-ভঙ্গি ও নিস্তব্ধতা দেখিয়া বুঝিলেন, সম্রাটের মনে ভীষণ ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং সময়োচিত ব্যবহারে তাহাতে শান্তি-বারি বর্ষণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা সেই রোষানলে তিনি স্বয়ং ভস্মীভূত হইতে পারেন। এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া আয়াজ সুলতানের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে নিরত হইলেন; তিনি স্বীয় স্বাভাবিক বাঙ্‌মাধুর্য্যে ও চাতুর্য্য-কৌশলে বিশদভাবে বুঝাইয়া

আত্মদোষ ক্ষালন পূর্ব্বক যাবতীয় অপরাধ কবির মস্তকে এরূপে প্রত্যর্পণ করিলেন যে, নিরীহ ফেরদৌসী সহজেই রাজার প্রতি অসম্মান ও অবমাননা, প্রদর্শনজনিত অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলেন।

দুষ্টাশয় আয়াজের বাক্যে সুল্‌তানের মনের গতি অন্য দিকে ফিরিল। তিনি নিজে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহাকে চিরদিন সন্তপ্ত ও সভ্য সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে, তিনি সেই অপকর্ম্মের প্রস্তাবক ক্রূরমতি আয়াজের ত্রুটি আর কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না; পক্ষান্তরে নিরীহ ফেরদৌসীকেই যত দোষের মূল বলিয়া অবধারণ করিয়া লইলেন। তখন ফেরদৌসীর ঔদ্ধত্য, অসৌজন্য ও অবজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া গজনী-পতি বিজাতীয় ক্রোধে স্ফীত ও অধীর হইয়া উঠিলেন। কে যেন সহসা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিল। তিনি ভাবিলেন, "একটী কপর্দ্দকের জন্য যে ব্যক্তি লালায়িত, ষষ্টি সহস্র দেরহাম তাহার অগ্রাহ্য! এবং তৎসহ আমার অবমাননা! উঃ! ফেরদৌসীর এতদূর অভব্যতা! ভেক হইয়া ভুজঙ্গকে তুচ্ছজ্ঞান! ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গ হইয়া মহাকায় মাতঙ্গের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান!! কি অসহনীয় স্পর্দ্ধা! কি গর্ব্বের কথা!! অহো এ প্রাণস্পর্শী ভীষণ অপমান কি সহ্য করিতে পারা যায়? দোষীর দণ্ডবিধান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।" রোষোন্মত্ত মাহমুদ এবংবিধ চিন্তার পর প্রতিহিংসা-প্রণোদিত হইয়া গভীর গর্জ্জনে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে,

কল্য প্রাতঃকালে রাজসম্মান ক্ষুণ্ণ করণাপরাধে দাম্ভিক ফেরদৌসীকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ভীষণ সংবাদ অচিরে নগরময় প্রচারিত হইল। দীন ধনবান, জ্ঞানী অজ্ঞান, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রবীণ, যে শুনিল, সেই স্তম্ভিত, সন্তপ্ত ও মহাক্ষুণ্ণ হইল। সকলেরই বদনমণ্ডল বিশুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। কবির বিপক্ষকুলেরও এ ঘটনায় ভীষণ মর্ম্মপীড়া ও চিন্তার অবধি রহিল না। সুলতান যে সহসা এরূপ কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহা তাঁহারা একবার স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন নাই। এক জন নিরপরাধ লোক, বিশেষতঃ অগাধ ধী-শক্তিশালী পণ্ডিত ব্যক্তি অকারণে নৃশংসভাবে মৃত্যু-নির্য্যাতন ভোগ করিবেন, ইহা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় বিবেকের বিষম দংশনে তাঁহারা জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিলেন। আক্ষেপে তাঁহাদের হৃদয়ে পাষাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু করিবেন কি ? উপায় নাই। তাঁহাদের কৃতকার্য্যের উপর আর অন্য একটী কথাও বলিতে কাহার সাহস নাই। অগত্যা সেই ভাবী ভীষণ দৃশ্য অনিবার্য্য ভাবিয়া সকলের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ রহিল।

এ দিকে মন্দভাগ্য ফেরদৌসী জনৈক বন্ধুর প্রমুখাৎ সুলতানের সেই কঠোর দণ্ডাজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার মস্তকে সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। হায় হায় এবার আর পরিত্রাণ নাই, আসন্ন রাজ-কোপানলে অচিরে ভস্মস্তূপে

পরিণত হইতে হইবে, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার অন্তর বিষাদ-সিন্ধুর অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইল; সহস্র যত্নেও তিনি কোন দিকে কূল দেখিতে পাইলেন না; তখন অধোবদনে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার অপাঙ্গে অশ্রুবিন্দুর সঞ্চার হইল, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ ঝরিল। যে হৃদয় বিমল আনন্দে উজ্জীবিত হইয়া প্রফুল্ল পদ্ম সদৃশ ঢল ঢল করিত, যে মুখমণ্ডল স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিধৌত হইয়া বিশদ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা পরিশুষ্ক—ম্লান। আজ তাহা রাহু-স্পৃষ্ট চন্দ্রের ন্যায় কম্পিত—শঙ্কিত; আজ তাহা কীট-দংশনে কুসুমবৎ সঙ্কুচিত। ভাবনায় তাঁহার বিস্তৃত ললাটফলক কালিমাময় ও কুঞ্চিত হইয়া গেল। অহো এই ভীষণ বিপদ-সময়ে ফেরদৌসী যে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কে অনুভব করিতে পারে? কিন্তু এ সংসারে বাস্তবিক জ্ঞানবান্ মহাপ্রাণ পুরুষেরা বিপদে নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হন না। তাঁহারা অসহ্য বিপত্তি-ভার মস্তকে ধারণ করিয়াও ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তদ্দারা সুফলও লাভ করেন। বিপন্ন কবি ধীরতার সহিত বহু চিন্তা, বহু বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে বুঝিলেন যে, এবারও সুলতানের করুণা-ভিক্ষা ব্যতীত প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর নাই। তিনি প্রভূত প্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর, বিচক্ষণ এবং বিদ্যালোক-সম্পন্ন হৃদয়বান পুরুষ; দয়া-ধর্ম্মে, সততায়, সুবিচারে এই বিশ্ব ভূমণ্ডলে তাঁহার প্রভূত সুখ্যাতি আছে। আমি

অভ্যাগত—দুর্ব্বল, তাঁহার আশ্রিত ; আবার তাঁহারই অনুমতি-ক্রমে তাঁহারই মনোনীত কার্য্যে নিয়োজিত। সুতরাং আমার প্রতি কি তিনি অবিচার করিতে পারেন? কখনই নহে। যদিই কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কুমতিক্রমে কোনরূপ অন্যায়ই করিয়া থাকি, তবে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ে কহিব, অশ্রুধারে তাঁহার পদতল সিক্ত করিব, তিনি অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন। বিনয়ে কিনা হইয়া থাকে? এ জগতে বিনয়ের অধীন কে নহে? যখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুপক্ষী-ভুজঙ্গমাদিও এই বিনয়-মন্ত্র-মুগ্ধ, তখন জ্ঞান-রত্নমণ্ডিত জীবশ্রেষ্ঠ মানব তাহাতে যে নম্র হইবে না, কে বলিল? আর যদি সেই বীর-হৃদয় নিতান্তই কাঠিন্য ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তবে তাহা কোমল করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যক করিবে না। কেননা তৃণস্তূপ অনল সহযোগে যেমন সহজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তেমনি আবার তাহা অল্প বারিপাতে সহজেই নির্ব্বাণ লাভ করে। বীরহৃদয়েরও প্রকৃতি এইরূপ! সুতরাং চিন্তা কিসের? ভয় কি জন্য? কল্য কি ঘটিবে, ভাবিয়া অদ্য তাহার জন্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করা নিতান্ত লঘুচেতা কাপুরুষের কর্ম্ম!

এইরূপ আলোচনায় ফেরদৌসী কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার অন্তরে শান্তির শীতল প্রবাহ মৃদুভাবে প্রবাহিত হইল। আশা-নৈরাশ্য, ভয়-নির্ভয়তা-সংমিশ্রণজনিত চিন্তায় রজনী কাটিয়া গেল। প্রভাতে বিহঙ্গমকুলের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তিনি সর্ব্ব বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্ব-বিধাতার পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে ত্বরিত-পদে রাজপ্রাসাদাভি-মুখে গমন করিলেন। শুভক্ষণে শীঘ্রই সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল। তখন বিচক্ষণ ফেরদৌসী প্রথমতঃ যথা-বিধি সম্মান সহকারে অভিবাদন পূর্ব্বক নতমস্তকে সুলতানের চরণ চুম্বন করিলেন। পরে মধুরকণ্ঠে সুললিত ভাষায় গজনীপতির বিদ্যা-বৈভব, বিচার-বদান্যতা, এবং তদীয় রাজত্বকালের প্রশংসা-কীর্ত্তন পূর্ব্বক করুণ-কাতরে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তিনি এমনি সঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আত্মদোষ খণ্ডন করিলেন যে, গজনীশ্বরের ক্রোধ-স্ফীত অন্তর শান্তিভারে অবনত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কবির কাকুতি-মিনতি অবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ফেরদৌসীর কবিতায় ও বাগ্মীতায় বিমুগ্ধ হইয়া এবং তদীয় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সম্মান রাখিয়া হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বাজ্ঞা প্রত্যাহার পুরঃসর অভয় দান করিলেন, কহিলেন, "আমি অপরাধ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু সতর্ক হউন, ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সত্য মতের অনুসরণ করুন।"

সোল্‌তানের অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া ফেরদৌসী সসম্মানে পুনরভিবাদন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি এক্ষণে আসন্ন সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইলেন বটে,—ভীষণ অপমৃত্যুর হস্ত হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু

তাঁহার হৃদয়ের বেদনার আর উপশম হইল না, মনে যে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা মনেই রহিয়া গেল। প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ-জনিত আশঙ্কা-আকুলতায় যে সুখশান্তি, উল্লাস-আরাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা আর তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিল না! তাই তিনি ভাবিলেন, এই শত্রু-সঙ্কুল ভয়াবহ স্থানে আর কোনক্রমেই অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। আমি প্রবাসী—একাকী! ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি আমার বলিতে আমার এখানে কেহই নাই। বিপদে আহা শব্দটীও কাহার মুখে শুনিবার আশা নাই; সুতরাং ক্রূরকর্ম্মা শত্রুকুল কখন্ কোন্ সূত্র ধরিয়া কোন্ প্রমাদে পাতিত করিবে, কে বলিতে পারে? তখন অরাতি-ষড়যন্ত্রে অবিচারে অকালে অমূল্য জীবন হারাইতে হইবে। তুচ্ছ অর্থোপার্জ্জন-আশায় অমূল্য প্রাণ-বিসর্জ্জন! অহো একথা স্মরণ করিতেও যে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ফলতঃ আর সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে, সত্বর গজনী-রাজ্যের বহির্ভাগে কোনও নিরাপদ স্থানে যাইয়া আত্মরক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

মহাকবি ফেরদৌসী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অপর একটী গুরুতর কার্য্য করিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি সুলতান মাহ্মুদকে অক্ষুণ্ণ-গৌরব রাখিয়া যাইবেন না, বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তজ্জন্য তিনি প্রথমতঃ কোন হিতৈষী বন্ধুর নিকটে আপনার পাথেয় সংস্থান করিয়া লইলেন। পরে গজনীশ্বরের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষের নিকট হইতে কৌশলক্রমে

শাহ্‌নামা পুনর্গ্রহণ করিলেন এবং রোষপরতন্ত্র হইয়া সমস্ত রজনী জাগ্রৎ থাকিয়া মাহ্‌মুদের প্রতিকূলে তীব্র তিরস্কার, কঠিন কথন ও ভীষণ কুৎসাসূচক একটী দীর্ঘ কবিতা রচনা পূর্ব্বক সংগোপনে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। অধ্যক্ষ সরলমনে শাহ্‌নামা দিয়াছিলেন, নিঃসন্দেহ সরলমনে তাহা পুনর্গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে রাখিলেন। কিন্তু রচয়িতা যে ক্রোধ-বশে তন্মধ্যে কি এক ভীষণ কালকূট ঢালিয়া দিয়াছেন, তদ্বিষয় তিনি অণুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। আমরা প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সেই ব্যঙ্গ-কবিতাটীর যথাযথ বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রদান করিলাম।—

হে রাজন্ অত্যাচারি! ভীম বাহুবলে,
করিয়াছ বহু রাজ্য জয়, বিশ্ব মাঝে
ভয় নাহি কর কোন জনে; কিন্তু জেন
পার্থিব বিভব—মণি-মাণিক্য-সম্ভার
নিত্য নহে, অতি তুচ্ছ অনিত্য অসার!
নিত্য সত্য ভবারাধ্য পরম-পিতায়
ডরিও সতত, আহা করোনা পীড়ন
মানব-সন্তানে যাহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর।
স্বর্গ-বাঞ্ছা থাকে যদি, দেহ আত্মবলি
অকাতরে তাঁর পথে। দিওনা যাতনা
এমন কি পীপিড়ারে, বসুন্ধরাতলে
যদিও সে হীনবল, ক্ষুদ্রকায় অতি;

কিন্তু ধরে দেহে প্রাণ দত্ত বিধাতার !
জীবন সমান প্রিয় সবারি জগতে,
সবারি সমান সুখ-দুঃখ-বোধ আছে।
অনল-প্রতিম তীব্র তেজোবীর্য্য-ভরা
প্রকৃতি আমার ন্যায়-নিরত নির্ভীক,
জেনেও কি হীনমতি ! হয়নি কম্পিত
থরথরি হিয়া তব ! চকিতে চমকি
উঠে নাই প্রাণ আর, শোণিত-পিয়াসী
তীক্ষ্ণ তরবারি মম করি দরশন ?
হও নাই সঙ্কুচিত ? হয়নি চেতনা
মর্ম্মদাহী ব্যথা দিতে মম সম জনে ?
কোন্ বশে রত হ'লে হেন হেয় কাজে ?
উপার্জ্জিলে নিজে আহা নিজ অপযশঃ !
তুচ্ছ গণি যারে, ঘৃণি ক্ষমতারে যার,
তাহার আদেশক্রমে মৃত্যু-দণ্ড-ভাগী
হ'ব আমি প্রমত্ত বারণ-পদতলে !!
কিসের কারণে ? হায় বল কোন্ দোষে ?
ভেবেছিলে মনোমাঝে হব তব ডরে
সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন আমি, তৃণের সমান
ভাবি যারে অতি লঘু গুরুত্ববিহীন !
আমি সে কেশরী ভীম শোণিত-পিপাসী,
গ্রাসি আমি অধার্ম্মিক পাষণ্ড দুর্জ্জনে।

চূর্ণিয়া তোমার দেহ পারি নিক্ষেপিতে
অতি দূরে নীল নদ-গভীর-সলিলে !
ভয় তোরে ? নাহি ডরি বিশ্বপতি বিনা
ক্ষুদ্র নরে আমি, নত করি এই শির
ভক্তিরসে মজি শুধু সেই শান্তিময়
মহাশক্তিমান্ বিশ্ব-বিভুর সকাশে।
দৈবজ্ঞান লাভ হেতু অনুগ্রহে তাঁর
কবিতা-প্রবাহ মম নিরমল অতি,
প্রবাহিত তর্ তর্ বেগে। আর তাঁর
দৃঢ় সুরক্ষণে থাকি দিবস যামিনী,
না ডরি এ পৃথিবীর অরাতিনিকরে !
এইরূপে মহানন্দে গানের গৌরবে
মজি নিরবধি, ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-প্রার্থনার ডালি
উৎসৃষ্ট করিয়া সেই বিভুর উদ্দেশে
জীবন যাপন মম হইবে অবাধে।
স্বাধীন বিবেক-বলে, জ্ঞানের প্রভাবে
ধীরচিত্তে পূর্ব্বাপর ভেবে বল দেখি,
মৃত্যু পরে হবে আহা কোন্ গতি তব ?
ছিন্ন করি অযুতাংশে দেহ যদি মম
অণু-পরমাণুরূপে দেহ উড়াইয়া
প্রবল বাত্যায়, তবু এ মর জগতে

অমর অনন্ত কাল ফেরদৌসী রবে !
জাগিবে তাহার নাম জগত জুড়িয়া !
কেননা প্রদীপ্ত মম এ বীর-গাথায়
নহিক যশস্বী আমি নাম-সহযোগে
তব হে মামুদ ! কিন্তু সে বিভুর বরে,
সংখ্যাতীত ধন্যবাদ-পাত্র যিনি ভবে,
আর সে মহিমান্বিত মাহাত্ম্য-সাগর
প্রেরিত-পুরুষশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহে, যাঁর
পুণ্য-প্রেমে তরিবেন বিশ্বাসীনিকরে
অন্তিম বিচার-দিনে সঙ্কট-পাথারে !
আত্ম-সমর্পণ আহা যে না করে তাঁয়,
নৈরাশ্যে জীবন তার হবে তেয়াগিতে।

নিক্ষেপ করিবে মোরে হে নিষ্ঠুররাজ !
মত্ত হস্তী-পদতলে, যাবত জীবন
এ দেহে রহিবে ? অহো আমার মরণ !
এই অবমাননায়—ঘোর যাতনায়
পরাণ ব্যাকুল মম উন্মত্ত অধীর,
উত্তপ্ত শোণিত বহে দেহ-স্তরে স্তরে,
প্রমত্ত মাতঙ্গ সম বলী আজি আমি !
ভাগ্য-গতি ফিরাইব তব হে মামুদ !
মানবের ভয়ে যদি নহ আতঙ্কিত,

কিন্তু কর ভয় সেই বিশ্বের নিদানে,
স্রষ্টা পাতা তব। আহা এই পৃথ্বীতলে
যুদ্ধবিশারদ কত বীরেন্দ্র-কেশরী,
কত রাজকুলজাত গুণান্বিত নর,
ধার্ম্মিক সুজন কত—সলিম, জাম্‌শেদ্,
শূর তুর, আর মনুচেহর তেজস্বী (১)
জন্ম লভি সাঙ্গ করি লীলা, চিরতরে
গেছেন ত্রিদিব স্থানে, বৃথা শক্তি আহা!
বীরত্ব-বিভঁব আদি সবি অকারণ!
কিছুতেই পারে নাই রক্ষা করিবারে
সেই বীর-ধীরকুলে মৃত্যু-গ্রাস হ'তে।
গেছে বটে তাঁরা চলে, কিন্তু জাগরূক
আছয়ে মানসক্ষেত্রে জগতবাসীর।
মরিবে মরিবে আর যত রাজগণ,
কেহই রবেনা হেথা, হবে ধূলিগত
অসার অনিত্য যত মানব-শরীর।

অহো!

জনক তোমার যদি হে গজনীপতি!
ভেবে দেখ, হইতেন রাজভাগ্য-ভাগী,
রাজগুণান্বিতা মাতা আর, তবে আজি

(১) ঐতিহাসিক মহাকাব্য শাহ্‌নামায় এই বীরবৃন্দের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এ দীন কবির ভাগ্য হ'ত উজ্জ্বলিত,
সম্মান-সম্পদ যার ন্যায্য পুরস্কার।
কিন্তু সে মর্য্যাদা দিবে কেমনে আমারে ?
গৌরবের স্পৃহনীয় সেই পথ হতে
দূরে—অতি দূরে আহা তব অবস্থান।
নহে তব পিতৃকুল উচ্চ সম্মানিত,
জন্ম তব নীচ কুলে, ইস্পাহানের
কর্ম্মকার-সুত তুমি (১) বুঝে দেখ মনে,
পাপ হ'তে হয় কিহে পুণ্যের উদ্ভব ?
অত্যাচারী রাজ ঠাঁই দয়া কি সম্ভবে ?
বদলে কি জলে ধু'লে মসীর বরণ ?
তমস্বিনী তমঃ দূর কে পারে করিতে ?
যে বিটপী করে দান ফল তিক্ততম,
চির তিক্ত রোপিলেও স্বর্গোদ্যানে তাহা !
মন্দ চিত্ত পাপে রত, যদিই বদলে,

(১) ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সুলতান মাহ্‌মুদের পিতা সুলতান নাসিরদ্দীন সবক্তগীন, আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপ্তগীন সবক্তগীনের গুণে মুগ্ধ হইয়া বুখারা প্রদেশের জনৈক সওদাগরের নিকট তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লয়েন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, সবক্তগীন পারস্যের সম্রাট্ এজ্‌দজোর্দ্দের বংশোদ্ভব ছিলেন, কালের গতিতে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হন। কিন্তু ফেরদৌসী তাঁহাকে কর্ম্মকার-তনয় অবধারণে তৎপুত্র মাহ্‌মুদকেও "ইস্পাহানের নীচ কর্ম্মকার-সুত" বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। ফলতঃ ইহার কোন্‌টী সমীচীন, এক্ষেত্রে তাহার বিচার করিবার আমাদের আবশ্যক নাই।

ভীষণ ভীষণতর পাপে আরো ধায়!
পক্ষান্তরে ত্রিদিবের নিত্য বিকশিত
পুষ্পোদ্যানে দুগ্ধ-নদী যত যায় বয়ে,
মধুরে মধুর সুধা লাভ করে আরো!!
তব সম অত্যাচারী যে রাজা পীড়নে
দীনে, চির অপযশঃ ঘোষে তার ভবে।
এবে তুমি লক্ষ কর লক্ষ্য ফেরদৌসীর,
রাজাবলী গ্রন্থ তাঁর জিনিয়া সকলে
চির বিরাজিবে ভবে, নানা বিষয়িণী
মধুর কাহিনী, চারু তত্ত্ব-গাথা তার,
শুনে পরিতৃপ্ত হবে নরনারীকুল,
জ্ঞানীর জ্ঞানের মাত্রা আরো যাবে বেড়ে।
প্রাচীন যুগের যত বীর বীর্য্যবান্,
মোহন গীতের মম ললিত ঝঙ্কারে,
রহিবে সজীব চির অক্ষয় উজ্জ্বল
শোভা-প্রভা বিস্তারিয়া মানব-সমাজে!
গাহিনি কি আমি তুস্, কাউসের গান?
গাহিনি কি গেও, সাম, গোদার্জ্জ-কাহিনী?
আর সে অতুল্য বীর রোস্তম-মহিমা?
করি নাই দেওবন্দ বীরত্ব-বর্ণন,
শত্রুনাশে শস্ত্র যার ছুটিত বিমানে?
রাজ-অঙ্গীকারে আমি প্রলুব্ধ হইয়া

ত্রিংশ বর্ষব্যাপী ঘোর শ্রমের যাতনা
সহিলাম প্রাণে, কিন্তু হায় কি আক্ষেপ,
বলিতে ফাটিছে বুক, বৃদ্ধ কবি এবে
প্রতারিত উপেক্ষিত অত্যাচার-ক্ষুব্ধ,
প্রতিশ্রুত পুরস্কারে বঞ্চিত কুক্ষণে।

গজনীপতির গ্লানিসূচক এবং তদীয় মন্ত্রীর অদূরদর্শিতা-প্রকাশক আরও কতিপয় কবিতা পত্র মধ্যে বাদশাহের শিরোনামায় প্রেরিত হইল। এতদ্ব্যতীত সুলতান মাহ্‌মুদ পবিত্র মস্‌জিদের যে স্থানে উপবেশন করিয়া প্রতিদিন উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, ঠিক তাহার পুরোভাগস্থ ভিত্তিগাত্রে নিম্নোদ্ধৃত কবিতার মর্ম্মানুযায়ী একটী শ্লোক লিখিয়া রাখিলেন।

১

গজনীপতির সভা রত্নাকর সম,
অকূল অতলস্পর্শ কিন্তু অতিশয়,
আছে বটে রত্নরাজি তাহে অনুপম,
প্রভায় সিন্ধুরে শুধু করে প্রভাময়।

২

রত্ন লোভে যত্ন করে আমি অভাজন,
ফেলিলাম জাল, লাভ না হইল হায়,
কি দোষ সিন্ধুর তাহে ? ভুঞ্জে নরগণ
ভাগ্য-লিপি-বশে ফল নিয়ত ধরায়।

এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য অতি সাবধানে, অতি সঙ্গোপনে সন্ত্রস্ততার সহিত নির্ব্বাহ করিলেন, পরে হস্তে যষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক কবিবর শশব্যস্তে জীবন লইয়া পলায়নপর হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কবির দেশপর্য্যটন, স্বদেশ গমন, পরলোক-প্রাপ্তি ও সঙ্কল্পসিদ্ধি।

মহাকবি ফেরদৌসী গজনী হইতে সকলের অলক্ষ্যে বহির্গত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে নগর-সীমা উত্তীর্ণ হইয়া প্রান্তর-পথে প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন। কত গ্রাম, কত নগর, পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, নদী এবং কত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া অনাহার-অনিদ্রায় কত প্রাকৃতিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়া পরিশেষে তিনি কোহ্স্তানে (১) উপস্থিত হইলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা কবির কাব্য-শক্তিতে অতীব অনুরক্ত ছিলেন; তজ্জন্য তিনি ফেরদৌসীকে সাতিশয় সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বভবনে স্থান দান করিলেন। ফেরদৌসী এখানে আসিয়া স্বীয় দুরবস্থা, সুলতানের অত্যাচার ও মন্ত্রীর পরবিদ্বেষ বিষয়ে এক খানি কাব্য রচনা করিয়া জগৎবাসীর সমক্ষে ধরিবেন, বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু

(১) কোহ্স্তান প্রদেশ ফরগণা রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত। ফরগণা সৈহুন নদীর উত্তর তীরে ব্যাপিত ছিল।

রাজভক্ত কোহ্‌স্তানাধিপের অনুরোধে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আশাভঙ্গ হইল, আর কি জন্য থাকিবেন ? সত্বর রাজ্যান্তরে গমন জন্য,সচেষ্ট হইলেন।

কোহ্‌স্তান হইতে বিদায় লইয়া চিন্তাকুল কবি মাজেন্দারাণে(১) গমন করিলেন। মাজেন্দারাণরাজ তাঁহাকে সমধিক সম্মান ও ভক্তির সহিত আপনার দরবারে গ্রহণ করিলেন। এই রাজপুরুষ স্থলতান মাহ্‌মুদের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি কবিমুখে স্থলতান-ঘটিত যাবতীয় অপ্রীতিকর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু কবিকে আর স্থানদান করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি স্থলতানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম এবং আমার সম্মুখে আপনার কোন অনিষ্ট ঘটে, তাহাও আমি দেখিতে বাসনা করি না। তজ্জন্য আপনার আর এস্থানে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমি আপনার মর্য্যাদা রক্ষার্থে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছি, প্রসন্নচিত্তে তত্তাবত গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।"

কবির আশা ছিল, মাজেন্দারাণে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পরিশ্রান্ত প্রাণে শান্তি আনয়ন করিবেন। কিন্তু—

(১) পারস্যের উত্তর সীমাস্থ আলবোর্জ্জ পর্ব্বত ও কাস্পিয়ান সাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী জনপদ।

"অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুষিয়া যায়"

এই মহাবাক্যের সার্থকতা যে তাঁহাতেই পর্য্যবসিত, তাহা তিনি ধারণাই করিতে পারেন নাই। তিনি নির্দ্দয় নিয়তির বশে সময়-সাগরে অসহায় তৃণখণ্ডের ন্যায় তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাত সহিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। কোথায় যাইতেছেন? তাহারও স্থিরতা নাই—কূল নাই—লক্ষ্য নাই। এই তট-সংলগ্ন, পরক্ষণে তরঙ্গ-প্রহারে দূরে নিক্ষিপ্ত! যে দিকে যাইতেছেন, সেই দিকেই তাড়না, সেই দিকেই বিভীষিকা, সেই দিকেই নৈরাশ্যের ব্যাদনীকৃত করাল গ্রাস! অহো কি কঠোর ভাগ্য-বিড়ম্বনা। কি শোচনীয় নির্য্যাতন!! ফলতঃ মাজেন্দারাণরাজের স্পষ্টবাদিতায় ফেরদৌসী উৎকণ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু রুষ্ট হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিতে করিতে সত্বর সে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

এবার কবিপ্রবর মহামান্য খলিফার ভুবনবিখ্যাত রাজধানী বোগ্‌দাদ নগরে যাইয়া সমুপস্থিত। বোগ্‌দাদ সৌন্দর্য্য-মহিমায় অতুলনীয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্র-ভূমি। ফেরদৌসী নগরের শোভা-সমৃদ্ধি সন্দর্শনমাত্র মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার পথশ্রান্তি বিদূরিত হইল। কিন্তু এস্থলে তাঁহার পরিচিত বন্ধু কেহই না থাকায় তিনি বিষম অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস ইতস্ততঃ অবস্থান করার পর একদা সৌভাগ্যক্রমে এক জন সওদাগরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই সওদাগর ফেরদৌসীর গুণগ্রাম

বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি কবিকে পরমযত্নে আপন আবাসে আহ্বান করিয়া আনিলেন। আলাপ-আপ্যায়নে কতিপয় দিবস আনন্দে অতিবাহিত হইল। এক দিন সদাশয় সওদাগর ফেরদৌসী সমভিব্যাহারে বোগ্‌দাদেশ্বরের মন্ত্রীর ভবনে উপনীত হইলেন। তখন কোকিলকণ্ঠ কবির অমৃতময়ী বীণা হৃদয়-মন মাতাইয়া মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। তিনি মন্ত্রীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া এরূপ নিপুণতার সহিত একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন যে, সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ পুলকিত ও বিমুগ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে শত শত বার কবির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

গুণগ্রাহী মন্ত্রী গুণবান ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষা মানসে অগৌণে খলিফার দরবারে ফেরদৌসীকে উপস্থিত করিলেন। মহামান্য খলিফা কবির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং সভক্তি সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দৈবানুগ্রহে খলিফার প্রীতি ও প্রসন্নতা তৎপ্রতি আকৃষ্ট ও অবনমিত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অভাব, অসুবিধা, উদ্বেগ, আশঙ্কা প্রভৃতি যাহা কিছু তাঁহার অপ্রীতিকর ছিল, তত্তাবতই দূরীভূত হইয়া গেল। আবার তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা খেলিতে লাগিল। আবার তিনি খলিফার প্রাসাদে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে কমনীয় কবিতা-কুসুম চয়নে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে বোগ্‌দাধিপতির গুণানুকীর্ত্তনসূচক একটী সহস্রপদী কবিতা এবং পুণ্যাত্মা

ইউসফ ও জেলেখার প্রেমকাহিনী (১) তৎকর্ত্তৃক প্রণীত হয়। মহামতি খলিফা তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া কবিবরকে ৬০০০০ দিনার এবং তদীয় অসাধারণ গুণের পুরস্কার স্বরূপ রাজ-সম্মান-প্রকাশক একটী মূল্যবান্ পরিচ্ছদ প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

এ দিকে গজনীপতি প্রত্যুষ সময়ের উপাসনা নির্ব্বাহার্থ মস্‌জিদাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন, ভিত্তি-গাত্রে একটী শ্লোক লিখিত রহিয়াছে। তিনি নামাজ (উপাসনা) সমাধা করিয়া উৎসুক অন্তরে ভিত্তির নিকটে যাইয়া তাহা পাঠ করিলেন এবং মর্ম্মাবগত হইয়া যারপর নাই বিষণ্ণ ও বিরক্ত হইলেন। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কমল সহসা বিশুষ্ক হইয়া গেল এবং কি এক অননুভূত গুরুভারে অন্তর অবনত হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, ইহা ফেরদৌসীর কার্য্য এবং বুঝিয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য জনৈক পরি-চারককে অনুমতি করিলেন। কিন্তু ফেরদৌসী কোথায়? সেই নিগ্রহভীত সম্মানিত জ্ঞানী পুরুষ কোথায়? তিনি কি গজনীপতির অধিকার মধ্যে আর আছেন! পরিচারক কবির বাসগৃহে এবং অন্যান্য স্থানে বিস্তর অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া সুল্‌তান সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন

(১) ফেরদৌসী-কৃত ইউসফ-জেলেখা কাব্যের এক খণ্ড হস্তলিপি রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা পারস্যের অন্তবর্ত্তী ইরাক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নামে উৎসৃষ্ট।

করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহীপতে! কবি আর রাজধানীতে নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের অজ্ঞাতসারে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। সুল্‌তানের আদেশে পাছে বিপদগ্রস্ত হন, এই আশঙ্কাই তাঁহার পলায়ন করিবার প্রধান কারণ।"

পরিচারক-মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মাহ্‌মুদ অধিকতর সন্তপ্ত হইলেন। যেন সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া মন্ত্রীর সমক্ষে কবির জন্য নানা আক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে আবার ফেরদৌসীর পূর্ব্বোক্ত পত্র আসিয়া উপস্থিত। কি ভয়ানক ব্যাপার! জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। সুপ্ত শার্দ্দূলকে কে যেন অলক্ষ্য প্রহারে জাগরিত ও রোষাবিষ্ট করিয়া দিল। সুল্‌তান সেই আত্মনিন্দাপূর্ণ, সভাসদের নীচতা-জ্ঞাপক ও মন্ত্রীর অদূরদর্শিতার কুৎসাসূচক পত্র পাঠ করিয়া অতীব উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে লাগিল, নয়ন-যুগল অগ্নিবৎ উজ্জ্বল হইল, কলেবর-কম্পন-বেগে আসন টলিয়া গেল। কিন্তু করিবেন কি? হস্তস্থিত তীর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পুনঃ তাহা ফিরাইয়া আনিবার উপায় কোথায়? তাই জ্ঞানরত্নমণ্ডিত বীরবর গজনীপতি বিবেক-বলে অনেকাংশে ধীরতা অবলম্বন করিলেন। পরে সেই রোষ-কষায়িত বিস্ফারিতলোচনে গুরুগম্ভীরস্বরে মন্ত্রীকে প্রভূত তিরস্কার করিয়া কহিলেন,

"তোমারই অদূরদর্শিতায়, তোমারই অবিবেচনা-অবহেলায় আমি সেই মধুরকণ্ঠ মহাকবিকে হারাইলাম। তোমার অনভিজ্ঞতার দোষে অথবা প্রতিহিংসামূলক ষড়যন্ত্রের বশে সামান্য অর্থ বিনিময়ে দুরপনেয় দুর্নাম ক্রয় করিলাম। চিরদিনের জন্য প্রতিজ্ঞাপালনাক্ষম কাপুরুষ নামে—দত্তাপহারী নামে অভিহিত হইলাম। যত দিন শাহ্‌নামা বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন জগতে বিদ্যাচর্চ্চা থাকিবে—ইতিহাসের সম্মান, কবিত্বের আদর, লোক-চরিত্রের আলোচনা থাকিবে, তত দিন জনসমাজে আমার এ অপবাদ-কাহিনী বিলুপ্ত হইবে না—এ কলঙ্ক-কালিমা দূরীভূত হইবার নহে। লোকে কথায় কথায়—উপমা-প্রসঙ্গে অবজ্ঞার সহিত আমার এ নিন্দাবাদ ঘোষণা করিবে। আমার এই সুশাসিত বিশাল সাম্রাজ্য, ভাণ্ডারপূর্ণ ধনরত্ন, সংখ্যাতীত হয়-হস্তী-সৈন্য-সামন্ত, দয়া-দাক্ষিণ্য-বিদ্যা-বদান্যতা, প্রজাকুলের এ সুখ-সমৃদ্ধি, কে তখন উল্লেখ করিবে? কে তখন এই সমুদয়ের আলোচনা করিবে? অথবা করিলেও তাহা কোন ফলোপধায়ক হইবে না, এই একটী দোষে আমার গুণরাশি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে; দুগ্ধভাণ্ডে অপবিত্র গোমূত্র পতনের ন্যায় দয়ামায়া, শীলতা-ভব্যতা, বিনয়-বদান্যতা, সৌজন্য-সহৃদয়তা প্রভৃতি আমার খ্যাতিপ্রতিপত্তি সমুদয়ই অনর্থক ও অনাদৃত হইবে। ইহা অপেক্ষা দারুণ ক্ষোভের বিষয়, মর্ম্মদাহী যাতনার কথা আর কি হইতে পারে? হায় হায় মনুষ্যও কি এমন কুকর্ম্ম করিতে পারে?"

সন্তপ্ত গজনীশ্বর এই প্রকারে অনেক আক্ষেপ ও অনুতাপ করিলেন। ক্রোধের পরিবর্ত্তে অনুশোচনার মর্ম্মভেদী অঙ্কুশ-আঘাতে তিনি যৎপরোনাস্তি যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে নিস্পন্দ-নয়নে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সভাসদবর্গের ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর শঠতা, কবির কষ্ট এবং নিজের ভ্রমজনিত অন্যায়াচরণ ইত্যাদি বিষয় একে একে উদিত হইল; তিনি একে একে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে প্রতিশ্রুত অর্থদানে কবির সন্তোষ-সাধন ও এই কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালন করাই শ্রেয়স্কর, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া মন্ত্রী ময়মন্দীর প্রতি অনুমতি করিলেন, "যাও, ফেরদৌসী যেখানেই থাকুন, নিকটে বা দূরদেশে, যে রাজ্যেই গমন করুন, ত্বরায় তাঁহার অনুসন্ধান কর। আমি তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছি, ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া অবিচার করিয়াছি, পক্ষপাতিত্বের একশেষ দেখাইয়াছি, ভ্রম-বশে সত্যের অপলাপ করিয়াছি। অতএব সেই কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার শত সহস্র ক্ষমাপ্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ প্রেরণে সেই পূজ্যপাদ প্রবীণ পুরুষের সন্তোষসাধন কর।" (১)

(১) জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা এই ঘটনাটী বিভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কবির পলায়নের বহু দিবস পরে, সুলতানের কোন একটী ভারতাক্রমণ সময়ে একদা প্রধান মন্ত্রীকে তাৎকালিক অবস্থানুযায়ী শাহনামার একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়া মাহমুদের মনে ফেরদৌসীর কথা জাগরিত হয়। তখন তিনি কবির প্রতি যে অবিচার ও অপব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষোভের সহিত তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী বলেন, কবি এক্ষণে অতিবৃদ্ধ এবং

মন্ত্রী ময়মন্দী সুল্‌তানের আদেশ নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি যে অপর কোন কঠোরাদেশ হয় নাই, তাই তিনি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে করুণাময় জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর আর কালবিলম্ব না করিয়া কবির অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোথায়ও তাঁহার অন্বেষণ পাওয়া গেল না, প্রেরিত ব্যক্তিগণ হতাশ মলিনমুখে একে একে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মন্ত্রী তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত ও চিন্তিত হইলেন। এই অকৃতকার্য্যতা হেতু পাছে আবার সুল্‌তান কুপিত হইয়া তাঁহার উপর কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, এই আশঙ্কায় তিনি দিন-যামিনী ম্রিয়মাণ অবস্থায় কাটাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে অবগত হইলেন যে, কবিশ্রেষ্ঠ ফেরদৌসী বোগ্‌দাদের মহামান্য খলিফার রাজসভার শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। এই সংবাদ মাহ্‌মুদের কর্ণগোচর হইলে, তিনি কবিকে গজনীতে প্রেরণার্থ মহামান্য খলিফাকে সানুনয় অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুনয়-বিনয়, যত্ন-আগ্রহ সমুদয়ই বিফল হইল, ফেরদৌসী খলিফার নিকট সুল্‌তানের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় আত্মীয়-স্বজন সহবাসে সুখে কাটাইবার

হীনাবস্থায় আছেন। তুস্‌ নগরে কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। তিনি এক্ষণে প্রকৃতই দয়ার পাত্র। সুলতান এতদ্‌শ্রবণে আপনার অঙ্গীকৃত অর্থ ও অপর পুরস্কার তাঁহার নিকট প্রেরণের অনুমতি করেন।

মানসে খলিফার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক জন্মভূমি তুস্ নগরে প্রস্থান করিলেন।

যখন ফেরদৌসী আর কোনক্রমেই গজনী-রাজসভায় আসিতে সম্মত হইলেন না,—গজনীপতির অভয় বাণীতে তাঁহার আর আস্থা জন্মিল না, তখন সুল্‌তান মাহ্‌মুদ অনন্যগতি হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও উপযুক্ত রাজসম্মানজ্ঞাপক একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ফেরদৌসীর নিকটে তুস্ নগরে প্রেরণ করিলেন এবং তৎসহ অনবধানতা প্রযুক্ত স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া প্রেরিত মুদ্রাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। রাজানুচরগণ যথাকালে তুস্ নগরে উপনীত হইলেন। কিন্তু হায় তাঁহাদের মস্তকের ভার নামাইয়া দিবেন কাহার নিকটে? কে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? বড়ই অনুতাপ ও নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয় এই যে, সুল্‌তান-প্রেরিত মুদ্রাদি কবির গ্রহণ করা দূরে থাকুক, একবার চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতেও হইল না; তিনি ইতিপূর্ব্বেই পার্থিব দুঃখের লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক অনন্ত সুখময় স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করতঃ স্বীয় ফের-দৌসী (১) নামের সার্থকতা ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ নগর-প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিতেই

(১) ফেরদৌসীর শব্দের অর্থ স্বর্গীয়। হিজরী ৪৩৮ সালে (১০২০ খৃষ্টাব্দে) কবির মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

দেখিলেন যে, কবির মৃত দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য সেই পথ দিয়াই বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। (২) এতদবলোকনে তাঁহাদের যুগপৎ শোক, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাঁহারা দৈবের এই বৈচিত্র্যময় ঐন্দ্রজালিক বিধানে চমৎকৃত হইলেন। কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া গেলে, তাঁহার পরিবারগণ শোকে-অনুতাপে কয়েক দিন অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর সুযোগানুসারে রাজকর্ম্মচারী-গণ সুল্‌তান-প্রেরিত মুদ্রাদি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করি-লেন। মহাকবির একমাত্র দুহিতা ব্যতীত পুত্র বা অপর কোন পুরুষ তদীয় পরিবার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। প্রতিবেশী-মণ্ডলী সুলতান-প্রেরিত পুরস্কার গ্রহণ বিষয়ক কথোপকথন প্রকাশ করিলে সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেজস্বিনী কন্যা শোক-গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিলেন যে, "সুলতান অর্থ ও পুরস্কার প্রেরণ

---

(২) শাস্ত্রবিধি অনুসারে মুসলমান মাত্রেই মুসলমানের কবর দর্শনে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা ও মৃত্যন্তে জানাজা নামাজে যোগদান করিয়া থাকেন ; কিন্তু কথিত আছে যে, ফেরদৌসী অগ্নি-উপাসকদিগের প্রশংসাসূচক অনেকগুলি কবিতা শাহনামায় লিখিয়াছিলেন বলিয়া একদা তাৎকালিক প্রসিদ্ধ তপস্বী মহাত্মা শেখ আবুল কাসেম গর্গানী (ইঁহার বিবরণ "তাজকেরাতল আউলিয়া" নামক পারস্য পুস্তকে দ্রষ্টব্য) তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ (জানাজা-নামাজ) প্রার্থনা করেন নাই। তাহাতে পরবর্ত্তী রজনীতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, ফেরদৌসী স্বর্গে গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। মহর্ষি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেই পরমপদ লাভের কারণজিজ্ঞাসু হইলে কবি উত্তর করেন যে, "সর্ব্বশক্তিমান পরাৎপর পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও মহত্ত্ব বিষয়ে আমি যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছি, তৎপ্রভাবেই আমার এই সুফলাভ ঘটিয়াছে। এতদ্‌শ্রবণে ঋষিবরের ভ্রম-নিরসন হইল, তিনি প্রভাতে কবিপ্রবরের কবরে যাইয়া ভক্তিভরা চিত্তে তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন।

করিয়াছেন। কিন্তু যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি আজ কোথায়? আমাদের সহিত ঐ অর্থরাশির সম্বন্ধই বা কি আছে? আমি পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। তিনি রাজাজ্ঞায় যে প্রকার কঠোরতম নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন;—অপমান, অবিচার, অন্যায়াচরণ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের জানিতে বাকি নাই। তিনি জীবিতাবস্থায় যখন ন্যায্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, আশায় প্রতারিত হইয়াছেন, এই ধন ভোগ করিতে পারেন নাই, তখন আমরা ইহা লইয়া কি করিব? ইহা দর্শন করিয়া সেই নির্ব্বাপিত শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে দ্বিগুণ শোকবিহ্বলা করিবে মাত্র। সুতরাং শোকের কারণ যে ধন, তাহা গ্রহণ করা ত দূরের কথা, স্পর্শ করিতেও আমরা প্রস্তুত নহি।”

বালিকার এই বেদনাব্যঞ্জক তেজোপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সমবেত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময় সংবলিত নীরব ও নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল, কেহই তাহার প্রতিকূলে একটী কথাও বলিতে সাহসী হইল না। কবির এক সহোদরা ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বুদ্ধিমতী সুশীলা মহিলা মৃদুস্বরে কহিলেন, “কন্যা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। বাস্তবিক আজ এই অর্থের কথা শ্রবণ করিয়াই আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান দ্বারা সুল্‌তানের অসন্তোষ উৎপাদন করাও অকর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। কেননা রাজ্যাধিপতির আজ্ঞাপালন ও সম্মান রক্ষা করিতে শাস্ত্রেও বিধি আছে। সেই

জন্য এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সাধারণ্যে বলিতে বাসনা করিতেছি; যদি যোগ্য বোধে সকলের মনোনীত হয়, তবে কার্য্যে পরিণত করিবেন। দেখুন, মহামান্য গজনীপতি আমার ভ্রাতার জন্যই এই বিপুল বিভব প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা আমার ভ্রাতারই প্রাপ্য, ভ্রাতা ব্যতীত এ ধনে অন্য কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু হায়, লীলাময় বিধাতার বিচিত্র বিধানে আজ তিনি স্বর্গগত। সুতরাং এই ধনে আর কে হস্তক্ষেপ করিতে পারে? তবে এক্ষণে ইহা তাঁহার বাসনানুযায়ী কার্য্যে নিয়োগ করিলেই তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার প্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে এবং আমরাও তদ্দ্বারা অনেকটা শান্তি লাভ করিতে পারি। আপনারা অবগত আছেন যে, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে নদীর জল প্লাবিত হইয়া এই নগরের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। তদ্দর্শনে আমার ভ্রাতা সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণমনে বলিতেন "যদি ঈশ্বরানুগ্রহে কখন ধনোপার্জ্জন করিতে পারি, তবে নগরবাসীদিগকে এই ক্লেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিব,—প্রস্তর দ্বারা নদীপার্শ্বে এরূপ এক উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে, নদী অতিপ্লাবিত হইলেও যেন নগরের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে।" ইহাই তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা ছিল; এই বাসনা চরিতার্থতা-উদ্দেশ্যেই তিনি গজনীশ্বরের কার্য্যে সুদূর প্রবাসে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব এই অর্থ দ্বারা যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের সেই বাসনা আজ সুসম্পন্ন হয়, আপনাদিগকে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ

করিতেছি। আর যদি এ প্রস্তাব মনোনীত না হয়, তবে আপনারা স্থল্‌তানের অর্থরাশির যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, আমাদের মতামতের অপেক্ষা করিবার আবশ্যক করে না।”

ফেরদৌসী-সহোদরা ইহা বলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার জ্ঞানী-জনস্থলভ স্থযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সকলেরই সন্তোষদায়ক হইল। কিন্তু রাজকীয় অনুচরগণ এই তত্ত্ব স্থলতানের কর্ণ-গোচর না করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না, বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে জনৈক চতুর সৈনিক গজনী অভিমুখে যাত্রা করিল এবং স্থল্‌তান-সম্মুখে উপনীত হইয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সদ্‌গুণশালী নরপতি কবির মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার অলৌকিক গুণের ব্যাখ্যা করিয়া কতই অনুশোচনা করিলেন। দরবার বিষাদপূর্ণ হইল; শত্রু-মিত্র, জ্ঞানী-মূর্খ, যুবা-বৃদ্ধ সকলেই সন্তপ্তহৃদয়ে শত আক্ষেপ করিল। পরন্তু মান্য স্থল্‌তান ফেরদৌসী-দুহিতার তেজস্বিতার কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন; বৃক্ষের পরিচয় ফলে পাইলেন। আবার কবির প্রতিভাশালিনী সহোদরার প্রস্তাবের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সেই প্রবীণা মহিলার মহৎ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করণার্থ এবং তৎসহ আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী স্বর্গীয় কবির স্মৃতি রক্ষার্থ অবিলম্বে কতিপয় স্থযোগ্য লোক প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যথাকালে তুস্‌নগরে উপনীত হইয়া স্থল্‌তানের উপদেশানুসারে কবির বাল্য জীবনের